প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
অবনীরঞ্জন রায়
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

মুদ্রক
সুধীরকুমার বসু
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪১ অনাথনাথ দেব লেন কলিকাতা ৩৭

ভূমিকা

হিতোপদেশ একটা গল্প-সংগ্রহমাত্র নয়; এটি রীতিমত একটা নীতিশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্র বলতে সাধারণতঃ বোঝাত রাজাদের জন্যে আচরণ-বিধি। এদেশে নীতিশাস্ত্রের চর্চা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এই শাস্ত্রের বড় বড় প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতি ও শুক্রের মত আচার্যেরা। ঐতিহাসিক কালে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য ছিলেন নীতিশাস্ত্রের একজন প্রধান পণ্ডিত; তিনি হাজার ছয়েক শ্লোকে একটা নীতিবচন-সংগ্রহ রচনা করেন। কৌটিল্যের, চাণক্য ছাড়া আরও একটা নাম ছিল—বিষ্ণুশর্মা। বিষ্ণুশর্মাই পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সত্যিকারের রচয়িতা না হলেও, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে তাঁর অসাধারণত্ব স্বীকার করার জন্যে, এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা তাঁদের সমস্ত বক্তব্য বিষ্ণুশর্মারই মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে। হিতোপদেশের গ্রন্থকর্তা 'কথারম্ভ'-এ সে-কথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন।

পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের গল্পগুলি কতকাল থেকে এদেশে চলে এসেছে, তা ঠিক করে বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, স্মরণাতীত কাল থেকে, এই গল্পগুলিই না হলেও, এই রকমের নানা গল্প এদেশের জনসাধারণের মধ্যে চলে আসছিল। আমরা রামায়ণে পাই, বানরের মুখে কথা, পাখী জটায়ুর মুখে কথা। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থেও পাই। জাতকের কয়েকটি গল্পের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের কয়েকটি গল্প হুবহু মিলে যায়। আমাদের ধারণা, এর জন্যে জাতক যেমন পঞ্চতন্ত্রের কাছে ঋণী নয়, তেমনি পঞ্চতন্ত্রও জাতকের কাছে ঋণী নয়। উভয়েই, নিজ নিজ উদ্দেশ্য, নিজেদের প্রয়োজন মত লোক-কথার বিপুল ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পঞ্চতন্ত্র কোন্ সময়ের রচনা? এর উত্তরে নিশ্চিতভাবে এইটুকুই শুধু বলা যেতে পারে যে, এটা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আগেই রচিত হয়েছিল। পারস্যরাজ নাসিরবানের সময় পঞ্চতন্ত্র পারসিক ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল বলে জানা যায়;—মূল পঞ্চতন্ত্র তার বহু পূর্বেই রচিত হয়ে কালক্রমে এদেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, এরকম অনুমান করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

পঞ্চতন্ত্রের পারসিক অনুবাদ হয়েছিল ষষ্ঠ শতকে; ঐ পারসিক অনুবাদের

একটা আববী অনুবাদ হয় নবম শতকে; আরবী থেকে পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থটি হিব্রু ও গ্রীক ভাষাতেও অনুবাদিত হয়। ঈশপ, পিল্‌পে প্রভৃতির কাহিনীর মূলে ছিল আমাদেরই পঞ্চতন্ত্র; অথচ, একালে আমরা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের ততটা খোঁজ রাখি না, যতটা রাখি ঈশপের।

আমাদের দেশে, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের আদর হয়ে এসেছে চিরকাল। আকবর বাদ্‌শা তাঁর বন্ধু আবুল-ফজলকে দিয়ে পঞ্চতন্ত্রের একটা সুন্দর অনুবাদ করিয়ে নেন। দেখা যাচ্ছে, আমাদের মুসলিম বাদ্‌শারাও এর মূল্য বুঝতেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতের সমস্ত ভাষাতেই পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্পগুলি চলে আসছে। তবে, একালে আমরা ভুলতে বসেছি যে, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ শুধু মনোরঞ্জনের জন্যে রচিত হয় নাই, আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকে সুবোধ্য করার জন্যেই হয়েছে গল্পগুলির অবতারণা। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সমস্ত গল্প পড়লেও, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ পড়া হয় না—যদি গল্পগুলি তাদের ক্রমপর্যায়ে না পড়া হয়। সমগ্র পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের স্থান শুধু গল্পগুলির দ্বারা পূরণ করা যায় না।

সমগ্র হিতোপদেশটি যে আমরা অনুবাদ করেছি, তার কারণই এই। অবশ্য, ঠিক মূলের সমস্তটার অনুবাদ এটি নয়। একালের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে আমরা অশ্লীল গল্পগুলি বাদ দিয়েছি। তাছাড়া, মূল গ্রন্থে একটি বিশেষ কোনো ভাবের কথা যেখানে বহু শ্লোকের সাহায্যে বলা হয়েছে, আমরা সেখানে দু' একটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ দিয়েছি। (একই কথার সমর্থনে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে একই ভাবের বহু উক্তি উদ্ধার করে দেওয়া ছিল সেকালের পণ্ডিতদের একটা রীতি!) শ্লোকের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন স্বয়ং আবুল-

হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদ এর আগেও হয়েছে। সেগুলি তো এযুগের ভাষায় লেখা হয় নাই! সেগুলিতে এ যুগের রুচিকেও আমল দেওয়া হয় নাই। আমাদের এই হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করার এই হল অজুহাত।

শুভেন্দু ঘোষ
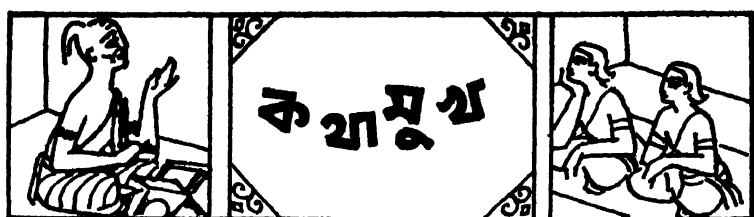
গঙ্গার ধারে পাটলিপুত্র সহর। সেখানে সুদর্শন বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সব রকম সদ্‌গুণই ছিল। একদিন তিনি শুনলেন, কে-একজন শ্লোক পড়ছে—

শাস্ত্র সবার চোখ, ঘুচায় মনের সন্দ।
শাস্ত্র-বিহীন লোক একেবারেই অন্ধ।

শ্লোক শুনে রাজা ভাবিত হলেন ; তাঁর ছেলেরা শাস্ত্রের ধার দিয়েও যায় না, যেমন খুশি চলে। তাঁর একটা শ্লোক মনে পড়ল—

নয় সাধু, নয় সুপণ্ডিত,
এমন ছেলেয় লাভ কী ছাই ?
চোখ থেকে তো কানা লোকে
পায় হে চোখের কষ্টটাই।

রাজা মহা চিন্তায় পড়লেন, ছেলেদের মানুষ করবেন কি করে। একবার তাঁর মনে হল—

হবার নয় যা, হবে না তা হবার হলে ঠেকায় কে ?—
চোখটি বুজে খাই না কেন চিন্তাজ্বরের পাঁচন এ ?

আবার মনে হল, নাঃ, যারা কাজ দেখে ডরায়, এ হল তাদের কথা। কারণ— তেল যা থাকে তিলে
পিষলে পরেই মিলে।

সত্যিই তো—

মন চাইলেই হয় নাকো কাজ ; চেষ্টা যে চাই অনেক দূর।
শিকার কি তার মুখে ঢোকে— সিংহ যখন নিদ্রাতুর ?

এই ভেবে রাজা পণ্ডিতদের সভা ডাকলেন ; তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন বিদ্বান কেউ কি আছেন, যিনি আমার অপদার্থ ছেলেদের নীতিশাস্ত্র শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে পারেন ? জানেন তো—

সুবর্ণের সঙ্গগুণে, মরকত-আভা কাচে ফোটে।
সজ্জনের সঙ্গ পেলে, মূর্খ সেও বিজ্ঞ হয়ে ওঠে।'

রাজার কথা শুনে নীতিশাস্ত্রের-বৃহস্পতি বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'দেব, বড় বংশেই জন্ম নিয়েছে আপনার ছেলেরা, আমি তাদের শিখিয়ে নিতে পারব। কথায় বলে—

পাত্র যদি যোগ্য না হয়, যত্ন যত হবেই নিরর্থক।
যতই কেন যত্ন করো, শুকের মত বোল শেখে কি বক ?

ছয় মাসের মধ্যেই আমি রাজপুত্রদের নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত করে দেব।'

রাজা সবিনয়ে উত্তর করলেন—

'ফুলের সঙ্গ করতে করতে, কীটও চড়ে মহাজনের মাথায়।
সাধুলোকে করলে স্থাপন, পাথরখণ্ড দেবতা হয়ে যায়।

হাঁ, আপনিই আমার ছেলেদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত লোক।' এই বলে, রাজা তাঁর ছেলেদের ডেকে বিষ্ণুশর্মার হাতে তুলে দিলেন।
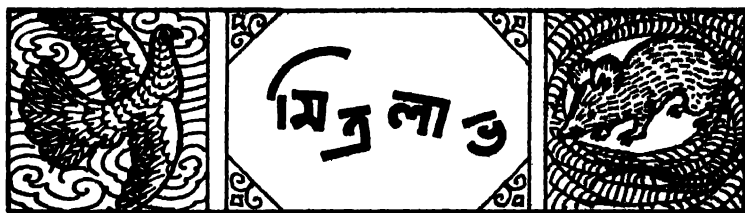
রাজবাড়ীর অলিন্দে রাজকুমাররা বেশ আরাম করে বসেছিলেন। বিষ্ণুশর্মা কথা পাড়ার ছলে তাঁদের বললেন, 'জানো তো—

পণ্ডিতদের সময় কাটে কাব্যশাস্ত্রে মেতে ;
মূর্খদের—কু-কাজে বা নিদ্রা-কলহেতে।

তাই, আমি তোমাদের কাছে কাক-কচ্ছপ প্রভৃতির গল্প করতে চাই।'

রাজকুমাররা বললেন, 'বলুন।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'কী রকম বন্ধু করতে হয়, সেই কথা দিয়ে সুরু করা যাক্। নীতিশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে প্রথম শ্লোক হচ্ছে, অসমর্থ নির্ধন হোক্—

বুদ্ধিমন্ত বন্ধুরা কাজ সেরে নেয় কত।
কাক-কচ্ছপ-হরিণ-ইঁদুর— চার বন্ধুর মত।'

রাজকুমাররা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে আবার কেমন?'

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—

কাক কচ্ছপ হরিণ ও ইঁদুরের গল্প

গোদাবরী নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ ছিল। নানা দিগ্দেশ থেকে পাখীরা এসে রাত্রিবেলায় সেই গাছটাতে বাস করত। একদিন, রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে, চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, লঘুপতনক

বলে এক কাক ঘুম হতে জেগেই দেখল, যমদূতের মত একটা ব্যাধ জাল হাতে করে এগিয়ে আসছে। ব্যাধকে দেখে সে ভাবতে লাগল—ভোর বেলাতেই এই অনিষ্ট-দর্শন হল ; কি জানি, আজ কি অমঙ্গলই ঘটে !—

ভয়ের কারণ অনেক থাকে ;
তারও বেশী কারণ থাকে শোকের।
পণ্ডিতে অগ্রাহ্য করেন ;
শান্তি নাইকো কিন্তু মূর্খ লোকের।

তবে, যে সংসারী—

সকালে ঘুম ভাঙার পরে, বুঝতে হবে তার,
মরণ রোগ শোকের মধ্যে, কোনটা সে হবার।

ব্যাধটা কিছু চাল ছিটিয়ে তার জাল বিছিয়ে দিল ; একটু সরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। ঠিক সেই সময় পায়রাদের রাজা চিত্রগ্রীব তার দলবল নিয়ে সেদিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। চালের দানাগুলি তার নজরে পড়ল। পায়রারা চাল খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে দেখে চিত্রগ্রীব বলল, 'এ তো নির্জন বন ; এখানে চাল এল কি করে ? সেটা দেখতে হয়। ব্যাপারটা কিন্তু ভাল বলে মনে হচ্ছে না। শেষে, চালের লোভে আমাদেরও সেই পথিকের মত মারা পড়তে না হয়— সেই যে পথিক—

সোনার কাঁকন নিতে গিয়ে ডুবল গভীর পাঁকে ;
বৃদ্ধ বাঘের হাতে পড়ে মরতে হল যাকে।'

পায়রারা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ? কী রকম ?'

চিত্রগ্রীব বললে—

বৃদ্ধ বাঘ ও পথিকের গল্প

একদিন আমি দক্ষিণের বনে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, এক বৃদ্ধ বাঘ স্নান সেরে, কুশ হাতে করে একটা ডোবার ধারে বসে আছে।

পথিকদের ডেকে ডেকে সে বলছে—'ওগো-ও ভালমানুষের পো, এসো, এই সোনার কাঁকনটা নিয়ে যাও!' একজন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, বাঘের কথা শুনে তার লোভ হল। সে মনে মনে ভাবল, নেহাৎ ভাগ্যে না থাকলে এমনটি ঘটে না; তবে যেখানে প্রাণের ভয়, সেখানে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ—

ভালোর লোভে, মন্দ কিছু দেয় না ভালো ফল।
সুধার সঙ্গে মেশানো বিষ মারকই কেবল।

তবু, যেখানেই লাভ, সেখানেই লোকসানের ভয়। দেখাই যাক না। হাঁক দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় তোমার কঙ্কণ?'

বাঘ হাত বাড়িয়ে দেখাল।

পথিক বলল, 'তুমি মারাত্মক জীব, তোমায় বিশ্বাস কী?'

বাঘ বলল, 'তবে শোন। আগে যখন যৌবন ছিল, তখন আমি বড়ই দুর্বৃত্ত ছিলাম, তখন বহু গরু-মানুষ মেরেছি, আর তার ফলে আমার স্ত্রী মরেছে, ছেলেরা মরেছে, আজ আমার কেউ নাই। এক সাধু আমায় উপদেশ দিলেন, "দান-ধর্মাদি করুন।" তাঁর কথা মত, এখন আমি নিত্য স্নান করি, দান করি। তা ছাড়া, আমি বৃদ্ধ; আমার দাঁত-নখ খসে পড়েছে। আমাকে বিশ্বাস করা যাবে না কেন? এখন আমি এতদূর নির্লোভ হয়েছি যে হাতের কাঁকনটাও যাকেই হোক্ দিয়ে দিতে চাচ্ছি। তবু বাঘে মানুষ খায় এই দুর্নাম তো যাচ্ছে না। তোমাকে তো খুবই দরিদ্র দেখছি; তাই এ কাঁকনটা তোমাকেই দিতে চাই। কথাই আছে

ধন দিও না ধনীজনে, দাও তা কোনো দুঃস্থকে।
রোগীর পথ্য ওষুধ দেয় কে বলো সুস্থকে?

তাই বলছি, এই ডোবার জলে স্নানটা সেরে এই সোনার কাঁকনটা নিয়ে যাও।'

বাঘের কথায় বিশ্বাস করে লোভী পথিকটা যেই না জলে নামল; অমনি গেল পাঁকে সিঁধিয়ে; তার নড়বার সামর্থ্য রইল না।

তাকে পাঁকে পড়তে দেখে বাঘ বলল, 'আহাহা, পাঁকে পড়ে

গিয়েছ? দাঁড়াও, আমি তোমায় তুলছি।' এই বলে সে ধীরে সুস্থে পথিকের কাছে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। বাঘের হাতে পড়ে পথিক ভাবতে লাগল—

দুরাত্মা যে, হয় না সাধু বেদপাঠে বা শাস্ত্রপাঠে—
দুধটা তাদের হয়ই স্বাদু যে-ঘাসই খাক্ গাইরা মাঠে।

—স্বভাবই প্রবল। এই মারাত্মক জীবকে বিশ্বাস করে ভালো করি নাই। কথাই আছে—

আগে স্বভাব, তার পরেতে অন্য গুণের বিচার।
অন্য সকল গুণের উপর তারই অধিকার।

এ-কথাও সত্যি যে—

নদীকে বিশ্বাস নাই, শৃঙ্গী বা নখীকে;
বিশ্বাস কর্তব্য নয় শস্ত্রধারী জনে।
মেয়েদের ভাব দেখে কোরো না বিশ্বাস;
বিশ্বাস কোরো না আর রাজবংশীগণে।

তাকে বেশি আর ভাবতে হল না; বাঘ তাকে মেরে খেয়ে ফেলল।

গল্প শেষ করে চিত্রগ্রীব বললে, 'এই জন্যই বলছিলাম, না ভেবে-চিন্তে কাজ করা ঠিক নয়।'

এ কথা শুনে একটা পায়রা দর্পভরে বলে উঠল—

'আপদ-কালে বুড়ার কথা মানা উচিত বটে;
সব ব্যাপারে মানতে গেলে অন্ন নাহি জোটে।

তা ছাড়া—

অন্ন বলো, অথবা জল, ভয়ের কারণ কোথা বা নাই?
তাই বলে লোক খাবে নাকো? দেহ-ধারণ অবশ্য চাই।'

এই শুনে সমস্ত পায়রাগুলি সেখানে গিয়ে বসল। কথাই আছে—

লোভ হতে কাম, ক্রোধ, মোহ, মৃত্যু হয়।
পাপের কারণ লোভ, নাই যে সংশয়।

এ-কথাও ঠিক যে—

সোনার হরিণ হয় না, তবু শ্রীরাম গেলেন খুঁজতে তাকে
বিপদ-কালে ধীমানেরও বুদ্ধি মলিন হয়েই থাকে।

সব পায়রাই জালে আটকা পড়ে গেল। যার কথায় তারা সেখানে নেমেছিল, তাকে তারা গালাগালি দিতে লাগল। এ তো হবেই, যেহেতু—

অনুচিত সকলের আগে আগে চলা;
কাজ সিদ্ধ যদি হয়, ভিন্ন নয় ফল।
বিপত্তি ঘটে যদি, ছুটেছিল আগে
যে নির্বোধ, দোষী হয় সেই তো কেবল।

তাদের গালাগালি শুনে চিত্রগ্রীব বলল, 'দোষ ওর নয়। কারণ—

বন্ধু দাঁড়ায় আপদ হয়ে, পড়লে দুঃসময়।
দোহন-কালে মায়ের পায়ে বাছুর বাঁধা রয়।

বিপদ্-কালে ঘাবড়ে যাওয়া হচ্ছে কাপুরুষের লক্ষণ। আমাদের এখন উচিত, ধৈর্য ধরে প্রতিকার চিন্তা করা। যেহেতু—

বিপদেতে ধৈর্য যার, অভ্যুদয়ে যার সহিষ্ণুতা,
সংগ্রামে বিক্রম আর সভাস্থলে বাক্যের পটুতা,
শাস্ত্রে অনুরাগ যার, অভিরুচি যার কীর্তিলাভে,
তারেই মহাত্মা জেনো আপন স্বভাবে।

এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, এক-মন হয়ে এক সঙ্গে সবাই জালসুদ্ধ উড়ে যাওয়া। কথাই আছে—

ক্ষুদ্ররা'ও ঐক্যগুণে মহাবল ধরে।
তৃণরজ্জু বেঁধে রাখে মত্ত গজবরে।

এ-কথাও সত্যি—

হোক্ না ছোট, আপন কুল কি ছাড়ে?
তুষকে ছেড়ে চাল গজাতে পারে?'

চিত্রগ্রীবের এই পরামর্শটা ভেবে দেখে পায়রারা সকলে জাল নিয়েই আকাশে উড়ল।

ব্যাধটা দূরে ছিল। পাখীগুলি তার জাল চুরি করে পালাচ্ছে দেখে সে তাদের পিছু পিছু ছুটল। ভেবেছিল, তা'রা পড়ে গেলে সে

তাদের ধরবে।

কিন্তু তা'রা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে অগত্যা তাকে থামতে হল।

ব্যাধ পিছন ছেড়েছে বুঝে, পায়রারা তাদের রাজা চিত্রগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি করতে হবে ?'

চিত্রগ্রীব উত্তর দিল—

'স্বভাবতঃ হিতকারী মাতা-পিতা এবং বান্ধব ;
প্রতিদানে অনুকূল আর-আর সব।

সুতরাং আমার বন্ধু, ইঁদুরদের রাজা হিরণ্যকের কাছে যাওয়া যাক্। তিনি গণ্ডকী নদীর ধারে চিত্রবনে বাস করেন। তিনিই আমাদের এই বাঁধন কেটে দেবেন।'

এই স্থির করে পায়রারা সকলে হিরণ্যকের গর্তের কাছে গেল। কখন কি বিপদ আসে এই ভয়ে হিরণ্যক একশো দরজার এক গর্তে বাস করত। পায়রাদের নামার শব্দে ভয় পেয়ে হিরণ্যক গর্তের ভিতর চুপ করে বসেছিল। চিত্রগ্রীব হেঁকে বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, আমাদের সম্ভাষণ করছেন না কেন ?'

হিরণ্যক তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সসম্ভ্রমে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল, বলল, 'ওঃ, কী পুণ্যবান্ আমি, প্রিয়বন্ধু চিত্রগ্রীব এসেছেন !—

মিত্রের সাথে সম্ভাষ যার, মিত্রের সাথে অবস্থান,
মিত্রের সাথে প্রসঙ্গ যার— তার চেয়ে আছে পুণ্যবান্ ?'

তারপর, তাদের জালে আটকানো দেখে কিছুক্ষণ অবাক থেকে সে বলল, 'বন্ধু, এ কী ব্যাপার ?'

চিত্রগ্রীব উত্তর করল, 'এ আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল। জানেন তো—

রোগ শোক বন্ধনাদি দুর্ভোগসকল
জীবদের নিজকৃত অপরাধ-ফল।'

কোন কথা না বলে হিরণ্যক তাড়াতাড়ি চিত্রগ্রীবের বাঁধন কাটতে গেল। চিত্রগ্রীব বলল, 'না, না, এমন করবেন না। আগে

আমার এই আশ্রিতদের বাঁধন কাটুন, পরে আমার বাঁধন কাটবেন।'

হিরণ্যক বলল, 'আমার শরীরে তেমন বল নাই, দাঁতগুলিও নরম, আমি কি এতগুলির বাঁধন কাটতে পারব? যতক্ষণ দাঁত আছে, ততক্ষণ আপনার বাঁধনটা কেটে দিই। তারপর, সাধ্যমত এদের বাঁধন কাটা যাবে। কারণ, কথাই আছে—

আপদ্‌ভয়ে অর্থ বাঁচাও, স্ত্রীকে বাঁচাও অর্থ দিয়ে ;
অর্থ দিয়ে পত্নী দিয়েও আপনা বাঁচাও।—সুনীতি এ।'

চিত্রগ্রীব বলল, 'বন্ধু, মানলাম এটাই সুনীতি, কিন্তু আমি যে কোনমতেই আশ্রিতদের দুঃখ সহ্য করতে পারব না।—

বিনাশ নিয়ত, তাই ধন ও জীবন—
পরতরে উৎসর্গ করে প্রাজ্ঞজন।'

এ কথা শুনে হিরণ্যক হর্ষিত হল ; আনন্দে তার রোমাঞ্চ হল ; সে বলল, 'ধন্য, আপনিই ধন্য, আশ্রিতের প্রতি আপনার এই মমতার গুণে আপনি ত্রিভুবনেরও প্রভু হওয়ার যোগ্য।' এই বলে সে সমস্ত পায়রার বাঁধন কাটতে সুরু করল। বাঁধন কাটা শেষ হলে, হিরণ্যক সকলকে আদর-আপ্যায়ন করার পর চিত্রগ্রীবকে উদ্দেশ করে বলল, 'জালে-পড়ার ব্যাপারে আপনার কিন্তু নিজেকে দোষী মনে করা ঠিক হয় নাই। কারণ—

শতেক যোজন দূরের থেকে আমিষ চেনে বাজপাখীতে ;
মরার সময় এলে সে-ও জালে-বদ্ধ হয় না কি হে?'

এই প্রবোধবাক্য বলে হিরণ্যক চিত্রগ্রীবকে বিদায়-আলিঙ্গন করল। চিত্রগ্রীব তার দলবল নিয়ে নিজের খুশীমত চলে গেল ; হিরণ্যকও নিজের গর্তে ঢুকল।

লঘুপতনক বলে সেই কাক সমস্ত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে দেখে অবাক হয়ে গেল, সে ইঁদুর-রাজকে উদ্দেশ করে হেঁকে বলল, 'ওহে হিরণ্যক, আপনাকে সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। আমিও আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমাকে বন্ধুত্ব দিয়ে অনুগ্রহ করুন।'

তা শুনে হিরণ্যক গর্তের ভিতর থেকেই উত্তর দিল, 'আপনি কে ?'

কাক বলল, 'আমি লঘুপতনক নামের কাক।'

হিরণ্যক একটু হেসে উত্তর দিল, 'আপনার সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কি ? জানেন না কি—

খাদ্যের সাথে খাদকের প্রীতি,— বিপরীত ফল তার।
শৃগাল হরিণে ফাঁসাল যখন, কাক করে উদ্ধার।'

কাক জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কী ? এ গল্প তো শুনি নাই।'

হিরণ্যক বলল, 'তবে শুনুন—

কাক হরিণ আর শৃগালের গল্প

মগধ দেশে চম্পকাবতী বলে এক বন আছে। সেখানে বহুদিন ধরে এক হরিণ আর এক কাক পরম বন্ধুভাবে বাস করত। হরিণটি খুশীমত চরে বেড়িয়ে বেশ মোটা-সোটা হয়েছিল। একদিন এক শৃগাল তাকে দেখতে পেয়ে ভাবল, আঃ, এটার নরম-নরম মাংস যদি খাওয়া যেত ! আচ্ছা, আগে এর মনে তো আমার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যাক। এই ভেবে সে হরিণটার কাছে এসে বলল, 'বন্ধু, ভালো আছেন তো ?'

হরিণ বলল, 'আপনি কে ?'

শৃগাল বলল, 'আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামের শৃগাল, এই বনে বন্ধুহীন অবস্থায় মড়ার মত পড়ে আছি। এখন আপনাকে বন্ধু পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ পেলাম। আমাকে আপনার বিশ্বাসী অনুচর বলে মনে করবেন।'

হরিণ বলল, 'বেশ তো, ভাল কথা।'

তারপর, সূর্যদেব পাটে বসলে তারা দু'জনে হরিণের জায়গায় গেল। সেখানে এক চাঁপা গাছের ডালে ছিল হরিণের অনেক কালের বন্ধু সুবুদ্ধি নামক কাকের বাসা। তাদের দু'জনকে আসতে দেখে কাক বলল, 'বন্ধু, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ?'

হরিণ বলল, 'ইনি শৃগাল, আমাদের বন্ধুত্ব-অভিলাষী হয়ে এখানে এসেছেন।'

কাক বলল, 'বন্ধু, নতুন লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। আপনি ভালো করেন নাই। কথায় বলে—

কুল অথবা শীল জান না, ঘর-ঢোকানো হয় কি ভাল ?
বিড়ালটারে ঠাঁই দিয়ে তো জরদ্গবটা প্রাণ হারাল।'

ওরা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম ?'

কাক বলতে সুরু করল।—

বৃদ্ধ শকুন আর বিড়ালের গল্প

ভাগীরথীর ধারে গৃধ্রকূট বলে একটা পর্বত আছে। সেই পর্বতে একটা বিরাট পাকুড় গাছ ছিল। তার কোটরে জরদ্গব বলে এক শকুন বাস করত, দৈব দুর্বিপাকে তার নখ আর চোখ দুই-ই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঐ গাছের পাখীরা কৃপা করে নিজেদের খাবার থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে তাকে দিত; তাতেই তার দিন চলত; তার বদলে সে তাদের বাচ্চাদের পাহারা দিত।

একদিন দীর্ঘকর্ণ বলে এক বিড়াল পাখীর বাচ্চা খেতে সেখানে এসে হাজির হল। তাকে আসতে দেখে পাখীর বাচ্চাগুলি ভয়ে কোলাহল করে উঠল। তা শুনে জরদ্গব হাঁক দিল, 'কে আসে ?'

শকুনকে দেখে দীর্ঘকর্ণ ভয় পেয়ে গেল, মনে মনে বলল, 'এই

রে গেলাম বুঝি! এ তো দেখছি আমাকে মেরে ফেলবে। তবে, শাস্ত্রে আছে—

বিপদকে ভয় করবে বটে, যাবৎ সেটা অনাগত।
এসে গেলে, প্রতিবিধান করাটাই বিহিত তো।

এতো সন্নিকটে এসে পড়েছি যে, পালানো এখন আর যাবে না। যা হবার হোক্ গে, এর বিশ্বাস জন্মিয়ে, কাছে যাওয়াই ঠিক।' এই ভেবে সে শকুনের কাছে এসে বলল, 'মহাশয়, নমস্কার।'

জরদ্গব বলল, 'তুমি কে হে?'

বিড়াল বলল, 'আমি বিড়াল।'

শকুন বলল, 'দূর হ, নইলে তোকে এক্ষুণি মেরে ফেলব।'

বিড়াল বলল, 'আগে আমার কথাটা শুনুন; তারপর, মারবার হলে মারবেন।'

শকুন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কেন এসেছিস, তাই বল্।'

বিড়াল বলল, 'আমি এখানে এই গঙ্গার ধারে বাস করি। প্রতিদিন স্নান করে, নিরামিষ খেয়ে, ব্রহ্মচারী হয়ে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালছি। পাখীদের মুখে সব সময়েই আপনার প্রশংসা শুনি। তাদের কাছে শুনেছি আপনি সর্বদা ধর্মচর্চা করেন; আপনি বিশ্বাস-ভাজন। বিদ্যায় এবং বয়সে আপনি বৃদ্ধ; আপনার কাছে ধর্ম শিখতে এসেছি। আর আপনি এমনিই ধর্মজ্ঞানী যে, দেখামাত্রই আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন! গৃহস্থের ধর্ম হচ্ছে—

শত্রুও আতিথ্য পাবে যদি আসে দ্বারে।
গাছ ছায়া দেয় তারে, কাটে যে কুঠারে।

ঘরে যদি অন্ন না থাকে, মিষ্ট কথা দিয়েই অতিথির পূজা করতে হয়। কথায় বলে—

কুশাসন, ভূমি, জল, প্রিয় বাক্য আর—
সুজনমাত্রের ঘরে থাকে এই চার।

আরও শুনুন— বাল-বৃদ্ধ-যুবা যেই হোক না অতিথি,
গুরুজ্ঞানে তার-ই সেবা গৃহস্থের রীতি।

আরও— নির্গুণ হলেও জীবে সাধু দয়া করে।
চণ্ডালেরও গৃহে চাঁদ আলোক বিতরে।
আরও— গৃহে যদি অভ্যাগত আতিথ্য না পায়,
গৃহীরে সে পাপ দিয়ে পুণ্য নিয়ে যায়।
তা ছাড়াও — উচ্চবর্ণ-ভবনেও নীচ যদি অভ্যাগত হয়,
যথাবিধি পূজ্য সেও, অতিথি যে সর্বদেবময়।'

শকুন বলল, 'তা সত্যি, কিন্তু বিড়াল মাংস খেতে ভালবাসে আর এখানে পাখীদের বাচ্চারা রয়েছে, তাই ও-কথা বলছি।'

বিড়াল প্রথমে মাটি, পরে তার দুই কান স্পর্শ করে বলল, 'আমি ধর্মশাস্ত্র শুনে ভোগে বীতস্পৃহ হয়ে এই দুষ্কর চান্দ্রায়ণব্রত পালন করছি। ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যতই গরমিল থাক, এ বিষয়ে সবাই এক মত যে, অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম। কোন্ শাস্ত্রে এ কথা নাই যে—

অহিংসা পরম ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়সংযম ;
অহিংসা পরম দান, অহিংসাই তপস্যা পরম।

এ তো অতি সত্য যে —

সর্বহিংসা-জয়ী যিনি, সর্বংসহ আর
সবার আশ্রয়স্থল, স্বর্গে গতি তাঁর।'

এই ভাবে বৃদ্ধশকুন জরদ্গবের বিশ্বাস উৎপাদন করে বিড়াল সেই গাছের কোটরে বাস করতে থাকল। দিনের পর দিন সে পাখীর বাচ্চাদের কোটরে নিয়ে এসে খেতে লাগল ; যে সব ধাড়ী-পাখীর বাচ্চা সে খাচ্ছিল, তারাও বিলাপ করতে করতে এখানে সেখানে খোঁজ নিতে সুরু করল। এ কথা টের পেয়ে বিড়াল কোটর ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর, পাখীরা খোঁজ করতে করতে সেই গাছের কোটরের মধ্যে তাদের ছানাগুলির হাড় পেল। "এই জরদ্গবই আমাদের বাচ্চাদের খেয়েছে"—এই ভেবে সমস্ত পাখী মিলে বৃদ্ধ শকুনকে বধ করে ফেলল। এই কারণেই বলছিলাম, যাদের কুল শীল জানা নাই, তাদের আশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

কাকের এই রকম কথা শুনে শৃগাল ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'হরিণের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন আপনিও তো, ম'শয়, অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন; তা হলে আপনার সঙ্গে এঁর প্রীতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে কী করে? কথাই আছে—

যেথা কেহ নাহিকো বিদ্বান্, অল্পধীও পায় কত মান!
যে দেশেতে বৃক্ষমাত্র নাই, বৃক্ষ-খ্যাতি পায় ভেরেণ্ডাই।

এ কথাও ঠিক যে—

'এ আপন, ওই পর' নীচাশয় গণে।
সবারে আত্মীয় ভাবে মহামতি জনে।

এই হরিণ যেমন আমার বন্ধু, আপনিও তেমনি আমার বন্ধু হয়ে যান।'

হরিণ বলল, 'এত কথায় কাজ কি? আসুন, আমরা মিলে-মিশে বন্ধুভাবে সুখে বাস করি। কারণ—

কেউ কারও মিত্র নয় কেউ কারও অরি।
ব্যবহার দিয়ে মোরা শত্রু—মিত্র করি।'

কাক বলল, 'তাই হোক্।' তারপর সকাল বেলা, তারা যার যেদিকে ইচ্ছে চলে গেল।

একদিন শৃগাল হরিণকে একান্তে ডেকে বলল, 'বন্ধু, এই বনেরই একদিকে একটা শস্যক্ষেত আছে; আমি আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।'

শৃগালের সঙ্গে গিয়ে হরিণ সেই শস্যক্ষেত পেল; প্রতিদিন সে সেখানে গিয়ে শস্য খেতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই ক্ষেতের মালিক তাকে দেখে ফেলে, ক্ষেতে জাল পাতল। হরিণ সেখানে আবার চরতে এসে জালে আটকা পড়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, 'কোনো বন্ধু ছাড়া কে আমাকে এই মরণ-জাল থেকে উদ্ধার করতে পারে?' ঐ সময় শৃগাল সেখানে এসে উপস্থিত

হল। সে মহাখুশী হয়ে মনে মনে বলল, 'আমার চালাকির ফল ফলেছে, দেখছি। অচিরেই আমার মনোরথ-সিদ্ধ হবে। ওকে কাটা হলে, ওর রক্তমাংস-সহ হাড়গুলি নিশ্চয়ই আমি পাব।'

হরিণ তাকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, 'বন্ধু, এক্ষণই আমার বাঁধন কেটে দিন। আমাকে বাঁচান। কথায় বলে—

আপদে বন্ধুকে চেনো, রণাঙ্গনে বীরে ;
ঋণপরিশোধ দেখে চিনিবে শুচিরে।
ভার্যাকে অভাব-কালে নিতে হয় চিনে ;
সঙ্গীর পরখ— দশা-বিপর্যয়-দিনে।'

শৃগাল জালটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে ভাবল, হরিণটা সত্যিসত্যিই শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছে ; মুখে বলল, 'বন্ধু, জালটা যে স্নায়ু দিয়ে তৈরী ; আজ রবিবার ; আজ এটাকে দাঁতে ছুঁই কি করে ? মনে যদি কিছু না করেন, কাল সকালে যা বলবেন, তাই করব।'

এদিকে কাকটি সন্ধ্যাবেলায় হরিণকে ফিরতে না দেখে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তাকে ঐ রকম অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, ব্যাপার কি ?'

হরিণ বলল, 'বন্ধুর কথা না শুনলে যা হয়, তাই হয়েছে। কথাই আছে—

শুনেও শোনে না যেবা হিতকাম সুহৃৎ বচন
বিপদ্ নিকটে তার, শত্রুর সে সুখের কারণ।'

কাক জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ঠগ্‌টা গেল কোথায় ?'

হরিণ বলল, 'আমার মাংস খাওয়ার অপেক্ষায় এখানেই কোথাও আছে।'

কাক বলল, 'আগেই তো আমি বলেছিলাম—

'ক্ষতি ওর করি নাই'—এই ভেবে কোরো না বিশ্বাস ;
স্বভাব-নৃশংস থেকে গুণীদেরও হয় সর্বনাশ।

এ কথাও তো মিথ্যে নয় যে—

দীপ-নির্বাণের গন্ধ পশে নাকো ঘ্রাণে,
সুহৃৎ-জনের বাক্য পশে নাকো কানে,
অরুন্ধতী চোখ যার এড়াইয়া যায়,
গতায়ু সে, মরণেতে বিলম্ব কোথায় ?'

তারপর, কাক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শৃগালের উদ্দেশে বলল, 'ওরে ঠগ্, কী কাজই তুই করেছিস !

আড়ালে যে কর্ম নাশে, সামনে বলে মিষ্ট কথা,
এমন মিত্র ত্যাজ্য সদাই— দুধমুখো বিষ-ভাণ্ড যথা।

কথাই আছে—

বৈর নয়, প্রীতি নয় দুর্জনের সাথে।
তপ্ত কয়লা ফোস্কা পাড়ে, ঠাণ্ডা কয়লা কালিয়ে ছাড়ে—
অসতর্ক হাতে।

দুর্জনের রীতিই এই রকম—

খল আর মশকেতে ভেদ কোথা, হায় ?
প্রথমে পড়িবে পায়ে, তার পরে পিঠে কামড়ায়।
কানেব নিকট করি কত না গুঞ্জন
ফাঁক বুঝি অতর্কিতে হুলটি চালায়।'

সকাল হলে, কাক দেখল ক্ষেতের মালিক লাঠি হাতে সে-দিকে আসছে ; তাকে দেখেই কাক বলল, 'বন্ধু, তুমি বায়ু দিয়ে পেটটা ফুলিয়ে, পা'গুলি নিশ্চল করে মড়ার মত পড়ে থাক ; আমি ঠোঁট দিয়ে তোমার চোখ দুটিকে ঠোকরাতে থাকব। তারপর যেই আমি কা-কা করে উঠব, অমনি উঠে পড়ে তুমি দৌড় লাগাবে।'

হরিণ কাকের কথা মত, মড়ার মত পড়ে রইল। হরিণকে ঐ অবস্থায় দেখে ক্ষেতের মালিকের চোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'আঃ, আপনা থেকেই মরেছ'—এই বলে সে হরিণের বাঁধন খুলে দিয়ে জাল গোটাতে লাগল। তারপর, ক্ষেতের মালিক একটু দূরে চলে গেলে, কাকের শব্দ-করা শুনে হরিণ চট করে উঠেই ছুট দিল। ক্ষেতের মালিক রাগের মাথায় আর হাতের
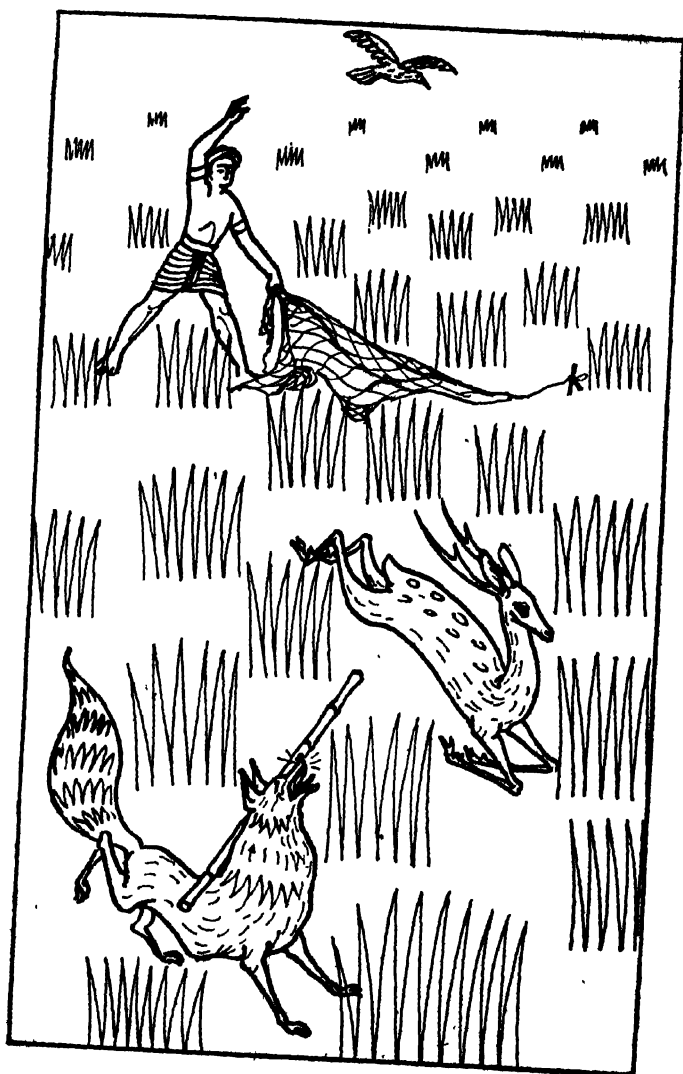
লাঠিটা তার দিকে ছুঁড়ে মারলে সেটা গিয়ে শৃগালকে লাগল সেটা মারা পড়ল। শাস্ত্রে আছে—

তিন বর্ষে, তিন মাসে, তিন পক্ষে, কিম্বা তিন দিনেই কেবল
অতিশয় পাপ পুণ্য এ-জন্মেই সভ্য সভ্য দিয়ে যায় ফল।

গল্পটি শেষ করে হিরণ্যক বলল, 'এই জন্যই বলছিলাম, খাদ্য-খাদকের মধ্যে কোন রকম বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।'

কাক লঘুপতনক উত্তর দিল, 'আপনাকে খেয়ে আমার কিছু পেট ভরবে না। আপনি জীবিত থাকলে এই চিত্রগ্রীবের মত আমিও জীবিত থাকব। রাগী আমি নই ; হলেই বা কী !—

রাগিলেও সাধু-চিত্ত বিকৃতি না পায়।
তাপে কি সাগরবারি তৃণাগ্নিশিখায় ?'

হিরণ্যক বলল, 'আপনি চপল ; চপলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। তা ছাড়া আপনি হচ্ছেন আমাদের শত্রুপক্ষ। শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভাব-পাতানো সঙ্গত নয়। কথাই আছে—

শত্রুর সাথে-ভাব অনুচিত হলেও ঘনিষ্ঠ।
তপ্ত হলেও জল অনলের করেই অনিষ্ট।

এ কথাও মিথ্যা নয়—

যত কেন হোক প্রয়োজন, শত্রুতে বা অসতী ভার্যায়
কবে যেবা বিশ্বাস স্থাপন মৃত্যু তার অনিবার্য, হায় !'

লঘুপতনক বলল, 'সবই শুনলাম। তবু আমি সংকল্প করেছি যে, হয় আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব, নয়তো আপনার দরজায় অনাহারে আত্মহত্যা করব। কথায় বলে—

দুর্জনের সঙ্গ যেন মাটির কলস—
সহজেই ভাঙে, জোড়া যায় নাকো ফিরে।
সুজনের সঙ্গ যেন সোনার কলস—
সহজে টুটে না, জোড়া যায় তা অচিরে।

এ-কথাও খুব ঠিক যে—

গলিত হলেই মেলে ধাতুতে ধাতুতে,
পশুপাখী মিলে যায় খাদ্য বিনিময়ে,
মূর্খেরা মিলে থাকে লোভে আর ভয়ে,
দেখামাত্র মেলে শুধু সাধুতে সাধুতে।

এটাও সত্য যে—

প্রণয় যদি বা টুটে, সুজনের গুণগুলি বিকৃতি না পায়।
ভগ্ন মৃণালের যথা তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া না যায়।'

এই সব কথা শুনে হিরণ্যক তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনার অমৃতবচন শুনে আপ্যায়িত হলাম।' তারপর কাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাকে বাছা-বাছা খাবার খাইয়ে সন্তুষ্ট করে মূষিকরাজ পুনরায় নিজের গর্তে প্রবেশ করল। কাকও নিজের জায়গায় চলে গেল। সেই দিন থেকে, তারা একজন অন্যকে ভাল ভাল খাবার উপহার দিত, কুশল প্রশ্ন করত; দুইজনে প্রাণখুলে আলাপ করত। এইভাবে কিছু দিন কেটে গেল।

একদিন লঘুপতনক হিরণ্যককে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, এখানে কাকের উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া বেশ শক্ত। তাই আমি অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করছি।'

হিরণ্যক বলল—

'নর নখ দন্ত কেশ— শোভা পায় নিজ নিজ স্থানে।
আপনার স্থান তাই ত্যজে নাকো কোনো বুদ্ধিমানে।'

কাক বলল, 'বন্ধু, এ তো কাপুরুষের কথা হল, কারণ—

মনস্বী বীরের লাগি দেশ কোথা নাই?
যেই দেশে প্রবেশেন জিনি লন তাই।
পরাক্রমী পশুরাজ যেই বনে যায়,
হস্তীরক্তে সেখানেই পিপাসা মিটায়।'

হিরণ্যক বলল, 'বন্ধু, কোথায় যাবেন? জানেন তো—

পা তুলেও যান নাকো, যিনি বুদ্ধিমান।
পর দেশ না দেখে কি ছাড়ে পূর্ব স্থান।'

কাক বলল, 'বন্ধু, জায়গা আমার ভালভাবেই ঠিক করা আছে।'

হিরণ্যক জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় সে জায়গা?'

কাক জানাল, 'দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌর বলে একটা হ্রদ আছে। সেখানে মন্থর বলে আমার পুরাণো বন্ধু এক কচ্ছপ বাস করেন।

তিনি সহজ-ধার্মিক। জানেন তো—

অন্যে উপদেশ দিতে পাণ্ডিত্যের কমি কারও নাই।
স্বয়ং আচরি ধর্ম শিক্ষা দেন শুধু মহাত্মাই।

মন্থর হচ্ছেন এমনি এক মহাত্মা। তিনি ভাল ভাল ভোজ্য দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত কববেন।'

হিরণ্যক বললে, 'তাহলে আমিই বা এখানে থেকে কি করব? কারণ— যেখানে সম্মান নাই, বৃত্তি নাই, বন্ধু কেহ নাই,
বিদ্যালাভ নাই কিছু—উচিত তো সে দেশ ছাড়াই।

আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন।'

কাক উত্তর দিল, 'বেশ তো চলুন।'

সেইমত কাক বন্ধুকে নিয়ে তার সঙ্গে নানারকম আলাপ করতে করতে মহানন্দে সেই হ্রদের কাছে গিয়ে পৌঁছল। মন্থর দূর থেকে লঘুপতনককে দেখতে পেয়ে, উঠে এসে তাকে যথোচিত আদর-অভ্যর্থনা করল। ইঁদুরেরও আতিথ্য-সৎকার করতে ত্রুটি করল না, কারণ— দ্বিজাতির গুরু অগ্নি, বর্ণগুরু সমাজে ব্রাহ্মণ।
স্ত্রীলোকের পতি গুরু, অতিথি সবার গুরু হন।

কাক বলল, 'বন্ধু মন্থর, এঁকে বিশেষ রকম পূজা করুন। পুণ্যকর্মাদের মধ্যে ইনি অগ্রগণ্য, ইনি দয়ার সাগর। ইঁদুরদের ইনি রাজা—নাম হিরণ্যক। সর্পরাজ যদি তাঁর হাজার জিভ দিয়েও এঁর গুণগান করেন, তাহলেও পেরে উঠবেন কিনা সন্দেহ।' এই বলে সে চিত্রগ্রীবের গল্পটা তাকে শোনাল। তা শুনে মন্থর হিরণ্যককে মহাসমাদরে পূজা করে বলল, 'আপনি নির্জন বনে কেন বাস করতেন জানতে ইচ্ছা করে।'

হিরণ্যক বলল, 'বলছি শুনুন।'

চূড়াকর্ণ ও বীণাকর্ণের গল্প

তখন চম্পক-নগরে পরিব্রাজকদের একটা ডেরা ছিল। সেখানে চূড়াকর্ণ বলে এক পরিব্রাজক থাকতেন। খাওয়ার পর যেটুকু ভিক্ষান্ন বাঁচত, সেটাসুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি দেওয়ালে-পোঁতা হাতীর-দাঁতের আকারের একটা গোঁজে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিদ্রা যেতেন। আমি প্রতিদিন লাফ দিয়ে উঠে সেই অন্নটা খেতাম।

একদিন তাঁর প্রিয় বন্ধু বীণাকর্ণ বলে এক পরিব্রাজক এলেন। তাঁর সঙ্গে নানারকম আলাপ আলোচনা করতে করতে চূড়াকর্ণ, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা ফাটা বাঁশের টুকরো দিয়ে মাটির উপর ঠক ঠক করে শব্দ করছিলেন। তা দেখে বীণাকর্ণ বললেন, 'বন্ধু, আমার কথা না শুনে অন্যদিকে মন দিয়ে আছেন কেন? কথায় আছে—

> প্রসন্ন চাহনি আর প্রফুল্ল আনন,
> আলাপে আগ্রহ আর মধুব বচন,
> স্নেহ সুমহান আর সাদর দর্শন—
> সদা-অনুরক্তে রহে এ-সব লক্ষণ।
> কৃতজ্ঞতা-নাশ আর অতুষ্টি-প্রকাশ,
> অবমানন আর দোষেরই কীর্তন,
> কথা-প্রসঙ্গেতে আর নাম-বিস্মরণ—
> বিরক্ত জনের জানি এগুলি লক্ষণ।'

চূড়াকর্ণ বললেন, 'বন্ধু, আপনার উপর আমি বিরক্ত হই নাই; কিন্তু দেখুন এই ইঁদুরটা সব সময় লাফিয়ে উঠে আমার পাত্রের অন্নগুলি খেয়ে যায়, বড়ই ক্ষতি করে আমার।'

গোঁজটার দিকে চেয়ে বীণাকর্ণ বললেন, 'এইটুকু ইঁদুর অতদূর ওঠে কি করে? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। " এ তো জানা কথা যে—

সব দেশে আর সকল কালে ধনবান্ যে, সেই-ই বলবান।
রাজা-মহারাজার প্রতাপ -মূলে ধনই, নয়কো কভু আন্।'

এই বলে বীণাকর্ণ আমার গর্তটা খুঁড়ে ফেলে আমার অনেক দিনের জমানো সমস্ত ধন সরিয়ে ফেলল। সেই থেকে আমি দুর্বল হতে লাগলাম, আমার মনের উৎসাহও চলে গেল। নিজের খাদ্যটাও আর জোটাতে পারতাম না। এ হেন অবস্থায় আমাকে কষ্ট করে চলতে দেখে চূড়াকর্ণ আপন মনে শ্লোক আওড়ালেন—

অর্থ গেলেই বুদ্ধি যায়।
যা-ই করে তা-ই ব্যর্থ হয়
গ্রীষ্মে-মজা নদীর প্রায়।
মিত্র তার জ্ঞাতি তার—ঘরে যার ধন,
'পুরুষ' ও 'পণ্ডিত' আখ্যা পায় সেই জন।
অপুত্রের গৃহ শূন্য, শূন্য গৃহ যার মিত্র নাই,
মূর্খের চৌদিক শূন্য, দরিদ্রের সবই শূন্য হায়।
দারিদ্র্য ও মৃত্যু মাঝে দারিদ্র্যই বিদিত নিরেস ;
দারিদ্র্যে দুঃসহ দুঃখ, মরণেতে সামান্যই ক্লেশ।
অবিকল কর্মজ্ঞানেন্দ্রিয়, নাম আছে তাই,
বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ কিছু কমে নাই
বচনও আগের মত, যেতে ধনটাই,
সেই সে পুরুষ হায়! আন্ হয়ে যায়।

এ-সব শুনে আমি ভাবলাম এখানে আমার আর থাকা উচিত নয়। কেননা—

দৈব হলে প্রতিকূল, ব্যর্থ হলে পৌরুষ শকতি,
অভিমানী দরিদ্রের একমাত্র বনবাসই গতি।

তা ছাড়া—

অভিমানী মরে তবু লঘুত্ব সে করে না স্বীকার।
অগ্নি না শীতল হয় নির্বাণও ঘটে যদি তার।

এ কথাও যথার্থ যে—

ফুল আর অভিমানী—বৃত্তি দুটি ধরে ;
সকলের শীর্ষে ওঠে, কিম্বা বনে ঝরে।

অন্য কাউকে এ দুঃখের কথা বলাটাও ঠিক নয়। কারণ—

আপন ঘরের ছিদ্র, মনস্তাপ কিম্বা অর্থনাশ,
অপমান বঞ্চনা বা—বুদ্ধিমান করে না প্রকাশ।

এখানে চেয়ে-চিন্তে জীবন-ধারণ করতে হচ্ছে, সেটাও অত্যন্ত গর্হিত ; কারণ—

বিভবহীনের পক্ষে অনলেতে শ্রেয়ঃ আত্মনাশ।
প্রার্থনা তত্রাপি নয়
শিষ্টাচার-ভ্রষ্ট কোনো কৃপণের পাশ।

একথাও অতি সত্য যে—

নির্ধনতা লজ্জা আনে ; লজ্জা যার, তেজ কোথা তার ?
নিস্তেজের ভাগ্যে হেলা, হেলা থেকে জন্মায় ধিক্কার ;
আত্মগ্লানি শোক আনে, শোক এলে বুদ্ধি লোপ পায় ;
বুদ্ধি-লোপে মৃত্যু ঘটে। দারিদ্র্যই নাশ-হেতু, হায়।

কথাই আছে—

কিছুই না বলা ভাল অসত্যের থেকে ;
শাঠ্য থেকে মৃত্যু ভাল নির্দোষ বিবেকে ;
পরধন-ভোগ থেকে ভাল ভিক্ষাহার ;
শূন্য গোষ্ঠ ভাল, তবু নয় দুষ্ট ষাঁড় ;
বাস ভাল বনে, নয় দেশে কু-রাজার ;
অধমের দ্বার চেয়ে ভাল মৃত্যু-দ্বার।

এটাও খুব খাঁটি কথা—

দাসত্বে সম্মান যায়,
তমোরাশি জ্যোৎস্নায়,
যায় লাবণ্য জরায়।
হরিহর নাম-গানে সর্বপাপ যায়
দরিদ্রের যত গুণ যায় অর্থিতায়।

সুতরাং পরের দেওয়া পিণ্ড গিলে বেঁচে থাকিই বা কি করে? সেও তো মৃত্যুর সামিল। কথায় আছে—

সুচির প্রবাস যার, নিত্যই ব্যারাম,
পরান্ন ভোজন যার, বাস পরধাম,
জীবনই মরণ তার, মরণ বিশ্রাম।

এ-সব চিন্তার পরেও সেই চূড়াকর্ণের অন্ন গ্রহণ করার আর একবার চেষ্টা করলাম। এ তো মিথ্যে নয় যে—

লোভে বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভ করে তৃষ্ণা-উৎপাদন ;
ইহকালে আর পরকালে তৃষ্ণা যত দুঃখের কারণ।

আস্তে আস্তে সেই অন্নটুকু নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই ফাটা বাঁশের ঘা খেয়ে ভাবলাম, যে লোভী, যে অসন্তুষ্ট, সে তো আত্মদ্রোহী হবেই—

সন্তোষ মনেতে যার সম্পত্তির কিবা তার নাই ?
পায়েতে থাকিলে জুতা চর্মাবৃত যেন ধরাটাই।

ঠিকই তো—

সবই জানা, সবই শোনা, সবই অনুষ্ঠিত তার,
তৃষ্ণারে পশ্চাতে রাখি নৈরাশ্যেই স্থিতি যার।

কোন সন্দেহ নাই যে—

যায় না যে ধনীর দুয়ার, বিয়োগের ব্যথা নাই যার,
বলে না যে দীনের বচন, ধন্য শুধু তাহার জীবন।

আবার—

তৃষ্ণায় টানিছে যারে, মানে না সে শতেক যোজন ;
হাতে অর্থ আসিলেও সন্তুষ্টের টলে নাকো মন।

সুতরাং এ-ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে কাজ করা উচিত। কেননা কথাই আছে— ধর্ম ? সে তো সর্বভূতে দয়া।
সৌখ্য ? সে তো নিত্য-অরোগিতা।
স্নেহ ? সে তো উপকার স্পৃহা
জ্ঞান ? সে তো কার্যে বিবেকিতা।

চাণক্য বলেছেন—

একেকে ছাড়িবে কুলের লাগিয়া ;
কুলকে ছাড়িবে রাখিতে গ্রামে ;
দেশের লাগিয়া গ্রামকে ছাড়িবে ;
আত্মার লাগি এ ধরাধামে।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে নির্জন বনে এলাম। কারণ—

বরং থাকিও ব্যাঘ্রগজাদির বনে—
বৃক্ষেতে বাসা বাঁধি, খেয়ে ফল-জল,
তৃণ শয্যায় শুয়ে, পরিয়া বাকল।
সুখ কোথা বন্ধু মধ্যে দরিদ্র জীবনে ?

সেই থেকে আমার পুণ্যোদয় হল, এই বন্ধুর নিরন্তর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হলাম। এখন আবার, পুণ্যপরম্পরায় আপনার স্বর্গতুল্য আশ্রয় পাওয়া গেল। সত্যই—

সংসার বিষের বৃক্ষ, দুটি ফল সুধাময় তার,
কাব্যের অমৃতাস্বাদ, সজ্জনের সঙ্গলাভ সার।

পুনশ্চ—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণ-ভক্তি, গঙ্গা-মৃত্যু আর—
অসার সংসারে তিনে ভাবি রাখ সার।'

মন্থর বলল—

'অর্থ তো পদধূলি, যৌবন তো স্রোত নির্ঝরের,
আয়ু যেন নবজন্ম, জলবিন্দু কমল-পত্রের।
দৃঢ় মনে ধর্ম করি খোলে না যে স্বর্গের অর্গল,
জরা এলে, অনুতপ্ত তারে দহে দুঃখের অনল।

আপনি অতিশয় সঞ্চয় করেছিলেন, সেইটা হয়েছিল দোষ। শাস্ত্রে কি বলে শুনুন—

ত্যাগেতেই রক্ষা পায় সংগৃহীত ধন।
তড়াগের জলোচ্ছাসে চাই নিঃসারণ।

আবার শুনুন—

কৃপণ মাটির তলে ধন পুঁতে রেখে,
করে নরকের পথ তৈরী আগে থেকে।'

পুনশ্চ—

আত্মসুখ রোধ করি যেবা চায় ধন-উপার্জন,
পর লাগি ভার বহি ক্লেশভোগী হয় সেই জন।

সত্যই তো—

ভোগ নাই, দান নাই—
কর্মভোগ বাঁচা তার, না বাঁচার প্রায়।
শ্বাস আছে প্রাণ নাই—
হাফরের হাঁশফাঁশ বৃথায়, বৃথায়।

এ কথা তো ঠিক—

যাচককে দেওয়া নাই, কি হবে সে ধনে ?
বল কেন ? না লাগিলে শত্রুর নিধনে !
শাস্ত্রপাঠে ফল ? যদি নাই ধর্মাচার।
সংযম না থাকিলে, কী অর্থ আত্মার ?

এটাও—

ভোগ তো সে করে নাকো, তাই
কৃপণের ধনে আর অপরের ধনে
ভেদ কিছু নাই।
ধন তারই সেটা জানা যায়
চোর নিয়ে গেলে তাহা, বেচারা যখন
করে হায় হায় !

কে না জানে যে—

কৃপণের ধন
ব্রাহ্মণের, দেবতার, মিত্রের বা আপনার, সেবায় না আসে।
কৃপণের ধন
পড়ে গিয়ে অগ্নি, চোর, নৃপতির গ্রাসে।

এ তো নিশ্চিত যে—

বিত্তের তিন গতি— দান, ভোগ, ক্ষতি।
দান ভোগ নাই ; নাশ নিশ্চিত অতি।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

প্রিয় বাক্য সহ দান,
পাণ্ডিত্যে নিরভিমান,
শৌর্য ক্ষমান্বিত আর ত্যাগ-সহ ধন—
দুর্লভ এই চার আর্য আচরণ।

কথাই আছে—

নিত্য কর্তব্য সঞ্চয়, কিন্তু অতিরিক্ত নয়।
শৃগালের কৃপণতা, দেখ—তার কাল হয়।'

ওরা দুইজন জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম ?

মন্থর বলতে সুরু করল—

ব্যাধ হরিণ শূকর সাপ ও শৃগালের গল্প

কল্যাণ-কটকে ভৈরব বলে এক ব্যাধ বাস করত। একদিন সে মাংসের লোভে হরিণ খুঁজতে খুঁজতে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করল। সেখানে সে একটা হরিণ মারল। সেখান থেকে হরিণ নিয়ে যেতে যেতে সে একটা ভীষণকায় শূকর দেখতে পেল। তখন হরিণটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে, সে তীর দিয়ে শূকরটাকে বিদ্ধ করল। শূকরটা তখন প্রলয় কালের মেঘের মত ঘোর গর্জন করতে করতে এসে তার তলপেট চিরে ফেলল ; শিকড়-ছেঁড়া গাছের মত ব্যাধটা সেখানেই পড়ে মারা গেল। কথায় বলে—

জল বা আগুন, শস্ত্র বা বিষ, ক্ষুধা নয় রোগ,
নয়তো সে, গিরি হতে পতনেই হোক্,
কোনও নিমিত্ত পেয়ে মারা যায় লোক।

শুধু তাই নয়, তাদের পায়ের দাপাদাপির চোটে একটা সাপও মারা পড়ল।

এখন সময় দীর্ঘরাব নামে একটা শৃগাল আহারের সন্ধানে সেদিকে ঘুরতে ঘুরতে ঐ মরা হরিণ, ব্যাধ, সাপ আর শূকরকে দেখে আপন মনে বলে উঠল—'আঃ, কী ভাগ্য আমার! আজ, দেখছি, আমার প্রকাণ্ড একটা ভোজের ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে—

কেবল দুঃখই নয়, অচিন্তিত সুখও যায় দেখা ;
এ ব্যাপারে বলী বটে ললাটের লেখা।

বেশ হল, এদের মাংস খেয়ে আমার তিন মাসের বেশিই কেটে যাবে—

মানুষটি একমাস, মাস দুই শূকর হরিণ,
সাপটা দিনেক যাবে. ছিলা খেয়ে আজকের দিন।

প্রথম ক্ষুধায় ধনুকে-লাগানো নিঃস্বাদু এই স্নায়ুটাই খাই।' সে তাই করতে গেল। ছিলাটা ছিঁড়তেই, ধনুকটা ছিটকে গিয়ে তার বুকে বিঁধল। দীর্ঘরাব পঞ্চত্ব পেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

নিত্য কর্তব্য সঞ্চয়,
কিন্তু অতিরিক্ত নয়।

কথাই আছে—

দেওয়া কিংবা খাওয়া যা হয় তাকেই বলি ধন।
মৃতের বিত্ত ফূর্তি করে উড়ায় অন্যজন।

যাকগে। এসব পুরাণো কথা বলে লাভ কি ? কারণ—

ধীরমতি যেই জন হয়
ঘুরিয়া মরে না সে তো অপ্রাপ্যের পিছে,
বিগতের লাগি শোক করে না সে মিছে,
আপদে সে মোহগ্রস্ত নয়।

এই কারণেই সর্বদা উৎসাহী থাকতে হয়, যেহেতু—

শাস্ত্র-পাঠেই হয় না বিদ্বান্,
শাস্ত্রমত চাই অনুষ্ঠান।
ঔষধ-নামেই যায় নাকো রোগ,
চাই তার সঙ্গত প্রয়োগ।

পুনশ্চ—

প্রয়োগ-ভীরুর লাগি বিজ্ঞান-বিধির গুণ নাই,
প্রদীপ অন্ধের হস্তে পথ তারে কভু কি দেখায় ?

সুতরাং দশাবিশেষে শাস্তি কর্তব্য। অতি কষ্টটাও মনে রাখা উচিত নয়—

সুখ দুঃখ যাই আসে, উপভোগ করে যাও তায় ;
সুখ দুঃখ চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে আর যায়।

তা ছাড়া—

ব্যাঙেরা ডোবায় আসে, বিলে আসে বক আর হাঁসে,
উদ্যোগী পুরুষ-পাশে সেইমত সব ধনই আসে।

এ কথা খুবই সত্য যে—

উৎসাহী যে, অনলস, ক্রিয়াবিধি জানে,
কাজ ফেলে যায় না যে খেলার সন্ধানে,
বীর ও কৃতজ্ঞ যেবা, দৃঢ় মিত্রতায়—
থাকিতে তাহার ঘরে লক্ষ্মী নিজে যায়।

বিশেষতঃ—

নির্ধন হলেও বীর বহুমান লভে ;
ধনী হয়ে লঘুচেতা উপেক্ষাই পায়।
কুকুর যদিবা সাজে সুবর্ণের হারে,
সিংহের সৈংহী কান্তি পাবে সে কোথায় ?

সত্যিই তো—

ধনী বলে গর্ব কেন ? ধন গেলে কেনই বা দুখ ?
মানুষ তো ওঠে পড়ে, বাজিকর-করের কন্দুক !

আবার দেখুন—

মেঘের ছায়া, শঠের প্রণয়, নারীর রূপ, নব শস্যচয়,
যৌবন ও ধন,—এই গোটা ছয়, দীর্ঘকাল উপভোগ্য নয়।

পুনশ্চ—

জীবিকার্থে অতিচেষ্টা কেন ? জীবিকা তো সৃষ্টি বিধাতার।
গর্ভাগত শিশুটির তরে দুগ্ধ নামে স্তনযুগে মা'র।

বন্ধু, আরও শুনুন—

হংসে যে করেছে সাদা, শুককে হরিত,
ময়ুর বিচিত্রবর্ণ যাঁহার সৃজিত,
বৃত্তি তব তাঁর দ্বারা হইবে বিহিত।

সাধুদের মনের কথাটা শুনে রাখুন,—

অর্থ কিসে সুখাধার ?
যাহার অর্জনে কষ্ট, কষ্ট যাহা হলে নষ্ট,
আধিক্যেতে মোহ যার,
হেন অর্থে সুখ কার ?

পুনশ্চ— ধর্ম লাগি অর্থচিন্তা যার,
নিশ্চেষ্টতা ভাল মানি তার।
পাঁক ঘেঁটে, সেই পাঁক ধোয়া,
তার চেয়ে ভাল যে না-ছোঁয়া।

শাস্ত্রে আছে—

আকাশে পক্ষী, ভূমিতে শ্বাপদ,
জলেতে কুমীর—মাংস খুঁজে খায়।
মাংসের মতই অবস্থা ধনীর ;
যেখানেই যাক, নিস্তার না পায়।

পুনশ্চ—

রাজা, অগ্নি, জল, চোর—বেশী কি ?—স্বজন,
—প্রাণীদের যেরূপ মরণ—
ধনীদের এরা নিত্য ভয়ের কারণ।

ঐ রকম—

চাহিয়া যায় না পাওয়া, নিবৃত্তিও নাহিকো চাওয়ার।
দুঃখময় এ সংসারে কোন্ দুঃখ আছে পরও তার ?

ভাই, আরও শুনুন—

এমনই তো দুর্লভ ধন, কষ্টকর তাহার রক্ষণ,
হলে নষ্ট মৃত্যুকষ্ট— হেন ধনে কেন দাও মন ?

ধন-তৃষ্ণা তেয়াগিলে, কে দীন ? কে ধনী ?
তাহারে প্রশ্রয় দিলে, দাস্য শিরোমণি।

এদিকে দেখুন—

চাওয়া থেকে চাওয়া বেড়ে যায় !
যা পেলে চাওয়ার শেষ, অর্থ হল তাই।

আর বেশী বলে কি হবে ? আসুন, এখানে থেকে আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপে কাল যাপন করুন। যেহেতু—

মহাপুরুষের প্রণয় আমরণ অবিকৃত রয় ;
ক্রোধ তাঁর উঠিয়াই তখনই হয়ে যায় লীন ;
ত্যাগও তাঁর অদ্ভুত, লেশমাত্র অনুরাগহীন।'

তা শুনে লঘুপতনক বলল—'বন্ধু মন্থর, আপনিই ধন্য। সর্বভাবেই আপনি শরণ্য। কারণ—

সাধুরাই করে থাকে সাধুগণে আপদে উদ্ধার।
পঙ্কেতে পড়িলে হাতী, হাতী টেনে তোলে তার ভার।

গুণজ্ঞ যে, গুণী সঙ্গে সুখ সেই পায়।
নির্গুণের গুণী-সঙ্গে পরিতোষ নাই।
বন হতে আসে অলি কমল লাগিয়া,
আসে না মণ্ডূক একই দীঘিতে থাকিয়া

তা ছাড়া—

মানব-ভুবনে সেই সর্ব-অগ্র-গণ্য,
উত্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্লাঘ্য আর ধন্য,
কোন দিন ফেরে নাকো যার দ্বারে আসি
নিরাশায়, প্রার্থী কিম্বা আশ্রয়-প্রত্যাশী।'

সেই থেকে তা'রা খুশীমত আহার বিহার করে মনের সুখে বাস করতে লাগল।

একদিন চিত্রাঙ্গ বলে এক হরিণ ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হল। হরিণের ভয়ের কারণটা নিশ্চয়ই তার পিছনে

পিছনে এসেছে এই মনে করে মন্থর জলে ডুবল, ইঁদুর তার গর্তে চলে গেল, কাকও উড়ে গাছের আগ্‌ডালে গিয়ে বসল। গাছের উচ্চচূড়া থেকে অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ করেও লঘুপতনক ভয়ের কোন কারণই দেখতে পেল না ; তার কথায়, তা'রা সবাই আবার মিলিত হয়ে সেখানে একত্র বসল। মন্থর হরিণকে ডেকে বলল, 'হরিণ ম'শয়, আপনার কুশল তো ? আপনার খুশীমত ঘাস জল খেয়ে বেড়ান ; এই বনে থেকে এই বনকে আপনি উজ্জ্বল করুন।'

চিত্রাঙ্গ বলল, 'এক ব্যাধের ভয়ে আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আমি আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আপনারা দয়া করে আমাকে বন্ধুত্ব দিয়ে বাধিত করুন। যেহেতু—

লোভ বা ভয়ের বশে পরিত্যাগ শরণ-আগতে
ব্রহ্মবধ-সম পাপ—শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের মতে।'

হিরণ্যক বলল, 'আমাদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব তো আপনা হতেই নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে। যেহেতু—

জন্মগত, বৈবাহিক, বংশক্রমাগত,
আপদে-রক্ষক আর—মিত্র চারি মত।

সুতরাং আপনি এখানে নিজের বাড়ীর মত থাকুন।'

এ কথা শুনে হরিণ আনন্দিত হল ; সে তার ইচ্ছামত ঘাস জল খেয়ে, জলের ধারে যে বটগাছ ছিল তার ছায়ায় গিয়ে বসল। কে না জানে—

শ্যামা স্ত্রী, দালান ঘর, বটের ছায়া, কূপের জল—
শীতকালেতে গরম আর গ্রীষ্মকালে হয় শীতল।

মন্থর জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই হরিণ, তুমি ভয় পেয়েছিলে কেন ? এই নির্জন বনে কি কোন ব্যাধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ?'

হরিণ বলল, 'কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ বলে এক রাজা আছেন। তিনি দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে এসে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক ফেলেছেন। কাল সকালে তিনি এখানে কর্পূরসরোবরের কাছে এসে থামবেন। এইসব গুজব ব্যাধদের মুখে শোনা যাচ্ছে। সুতরাং কাল সকালে

এখানেও থাকাটা ভয়ের কারণ হবে ; এ কথা বুঝে যা করণীয় করুন।'

তা শুনে মন্থর সভয়ে বলল, 'বন্ধু, আমি অন্য কোনো জলাশয়ে যাব।' কাক আর হরিণ দুজনেই বলে উঠল, 'তাই ভাল।'

হিরণ্যক একটু ভেবে চিন্তে বলল, 'আর কোনো জলাশয়ে গেলে মন্থরের মঙ্গল বটে, কিন্তু তার ভূমির উপর দিয়ে চলার কি উপায় হবে ? জানেন তো—

দুর্গবাসীর বল দুর্গ, জলজন্তুর জল,
শ্বাপদের বল নিজবন, রাজার সৈন্যদল।

ভূমিতে মন্থর যে দুর্বল। তবে অবশ্য—

শক্তিতে যা যায়না করা, যায় করা তা বুদ্ধি দিয়ে।
শৃগালেও হাতী মারে গভীর পাঁকের পথ দেখিয়ে।'

কচ্ছপ, কাক আর হরিণ একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ?'

হিরণ্যক বলল, 'শুনুন—

হাতী ও শৃগালের গল্প

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক বলে এক হাতী থাকত। তাকে দেখে শৃগালরা সব মনে মনে ভাবত, এটা যদি কোন মতে মারা পড়ে, তাহলে এর মাংসে আমাদের মাস চারেকের মত প্রাণভরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ শৃগাল প্রতিজ্ঞা করল, 'আমি বুদ্ধির জোরে এটার মরণ ঘটাব।'

অনন্তর সেই ঠগ্ শৃগালটি কর্পূরতিলকের কাছে গিয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'দেব, অনুগ্রহ করে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।'

হাতী বলল, 'তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ ?'

সে বলল, 'আমি শৃগাল, বনের সমস্ত পশু মিলে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। একজন রাজা ছাড়া কোথাও বাস করা

উচিত নয় ; এই বনরাজ্যে অভিষেকের জন্য তা'রা আপনাকেই রাজার যোগ্য সমস্ত গুণের আধার ব'লে স্থির করেছে। কারণ—

কুলাচারে লোকাচারে যিনি শুদ্ধ অতি,
প্রতাপী নীতিজ্ঞ যিনি, যিনি ধর্মমতি—
তিনিই তো উপযুক্ত হইতে ভূপতি।

আরও দেখুন—

প্রথমে তো রাজা চাই, পরে ভার্যা, তার পরে ধন ;
রাজাই না থাকে যদি, ভার্যা ধন কে করে রক্ষণ ?

আরও—

রাজা যে মেঘেরই মত জীবের আশ্রয় !
মেঘ না বর্ষিলে তবু প্রাণ রক্ষা হয় ;
রাজাহীন দেশে কিন্তু অনিবার্য ক্ষয়।

এ কথা মিথ্যে নয় যে—

বিরল স্বভাবসাধু এই ধরাতলে ;
সৎপথে সবাই প্রায় দণ্ডভয়ে চলে।

সুতরাং যাতে লগ্নবেলা না চলে যায়, তার জন্য আপনি সত্বর চলুন।' এই বলেই সে চলতে লাগল। রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হয়ে কর্পূরতিলক শৃগালের দেখানো পথ ধরে বেগে চলতে চলতে গভীর পঙ্কে গিয়ে পড়ল। হাতী বলল, 'ভাই শৃগাল, এখন কি করা যায় ? আমি যে গভীর পাঁকে পড়ে মরতে বসেছি ; ফিরে তাকাও।'

শৃগাল মুখ মুচকে হাসল, বলল, 'শুঁড় দিয়ে আমার লেজটা ধরে উঠে পড়ুন। আমার মত জীবের কথায় আপনি বিশ্বাস করেছিলেন, এ তারই ফল। এখন বুক চাপড়ে মরুন।'

অসৎ-সঙ্গ থেকে দূরে থাকলে শঙ্কা নাই।
অসৎ-সঙ্গে পড়লে যদি, পতন কে ঠেকায় ?

হাতী সেই গভীর পাঁকে থেকে মারা গেল ; শৃগালরা তাকে খেয়ে ফেলল।

গল্পটা শেষ পর্যন্ত শোনার মত মনের অবস্থা মন্থরের ছিল না। তার পক্ষে ভূমির উপর দিয়ে চলার কোন উপায় স্থির হওয়ার আগেই সে ভয়মুগ্ধ হয়ে কোন্ সময় সেই জলাশয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। হিরণ্যকরা স্নেহবশতঃ তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তার পিছন ধরল। মন্থর ভূমির উপর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে যাচ্ছিল; এক ব্যাধ বনে টহল দিতে দিতে তাকে পেয়ে গেল। সে তাকে তুলে তার ধনুকের সঙ্গে বেঁধে নিল। অনেক ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; ক্ষুধা-তৃষ্ণাতেও সে কাতর হয়ে উঠেছিল। সুতরাং মন্থরকে নিয়ে সে তার বাড়ীর দিকে চলল। হরিণ, কাক আর ইঁদুরও অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে তার অনুগমন করল।

'এক দুঃখের মেলে না কূল, আর দুঃখ উপনীত।
এক দুঃখের পিছন ধরে আসে দুঃখ অগণিত।

মিত্রতা স্বভাবসিদ্ধ বহুপুণ্যে জুটে,
অকপট মিত্রতা সে আপদে না টুটে।
স্বভাবজ মিত্রে যথা জন্মায় প্রত্যয়,
মাতা, দার, পুত্র কিংবা সোদরে তা নয়।

বারংবার এই সব কথা চিন্তা করে হিরণ্যক বলল, 'হায়! হায়! এ কী দুর্দৈব আমার—

স্বকৃত পাপ ও পুণ্য, জানি, ফল ধরে;
দশান্তর ঘটে কালান্তরে।
এ জন্মেই মোর কিন্তু হয় অনুভব
শুভাশুভ কর্মফল সব।

অথবা এমনই হয়—

দেহটা অচিরস্থায়ী; সম্পদও বিপদ-আকর;
মিলন বিয়োগান্বিত; জাতমাত্র হায় বিনশ্বর।'

আবার একটুখানি ভেবে সে বলল—

'দুঃখ বা শত্রুর ভয়ে করে যা উদ্ধার,
প্রণয় ও বিশ্বাসের অপূর্ব আধার,
'মিত্র' এ দ্ব্যক্ষর রত্ন সৃজিত কাহার ?

নয়নের যেবা হয় প্রীতি-রসায়ন,
হৃদয়ের যেবা হয় আনন্দ-কারণ,
সুহৃদের সুখে দুঃখে অংশী যেবা হয়,
এ সংসারে হেন মিত্র সুলভ তো নয়।

ধনলোভে আসে যেবা সমৃদ্ধির দিনে
যত্র তত্র দেখা মিলে তার।
বিপদেই ঝুটা খাঁটী নেওয়া যায় চিনে
বিপদই কষ্টি মিত্রতার।'

এমনি অনেক বিলাপ করার পর চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনককে হিরণ্যক বলল, 'ব্যাধ যতক্ষণ বনের বাইরে না যাচ্ছে, ততক্ষণ মন্থরকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।'

তা'রা উত্তর দিল, 'কী করতে হবে আদেশ করুন।'

হিরণ্যক বলল, 'জলের কাছটায় গিয়ে চিত্রাঙ্গ মড়ার মত নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকুন, কাক তার উপর বসে তার কোনও অঙ্গ ঠোকরাতে থাকুন। ব্যাধটা নিশ্চয়ই হরিণমাংসের লোভে কচ্ছপকে রেখে সেখানে ছুটে যাবে। আমি সেই ফাঁকে মন্থরের বাঁধন কেটে দেব। ব্যাধ আসতেই আপনারা পালাবেন।'

চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক তখনই তাই করল। ব্যাধ পরিশ্রান্ত হয়েই ছিল ; সে জল খেয়ে, গাছতলায় বিশ্রাম করতে গিয়ে হরিণটাকে পড়ে থাকতে দেখল। কচ্ছপটাকে জলের কাছে রেখেই সে কাটারিটা সঙ্গে নিয়ে মহা আনন্দে হরিণের দিকে চলল। এই অবকাশে হিরণ্যক এসে মন্থরের বাঁধন কেটে দিল। বাঁধন কাটা যেতেই কচ্ছপ তাড়াতাড়ি গিয়ে জলে পড়ল। হরিণও ব্যাধ কাছে এসে
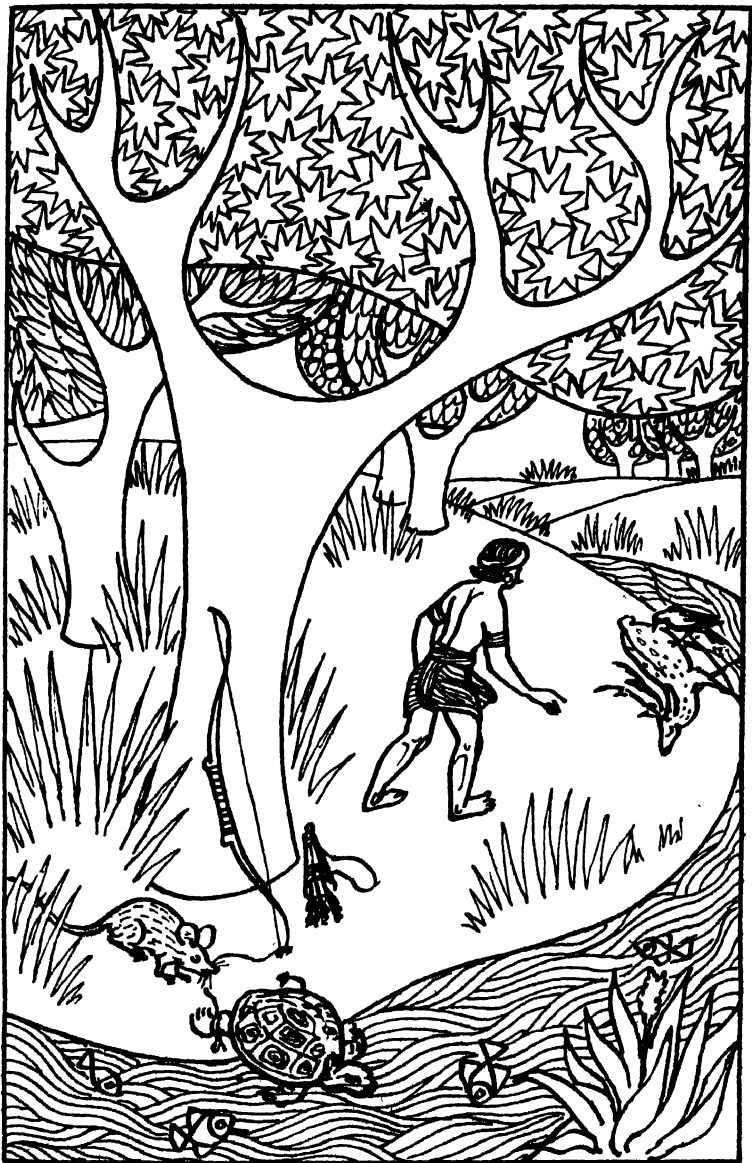
গিয়েছে দেখে উঠেই দৌড় দিল। ব্যাধ গাছতলায় ফিরে এসে কচ্ছপকে না দেখে আপন মনে বলে উঠল, 'আমার মত অবিবেচকের এমনই হওয়া উচিত। কারণ—

নিশ্চিতে ছাড়িয়া যেবা অনিশ্চিতে চায়,
অনিশ্চিত যায়ই তার, নিশ্চিতও যায়।'.

নিজের কর্মদোষে নিরাশ হয়ে সে তার শিবিরে গিয়ে ঢুকল। মন্থররাও বিপন্মুক্ত হয়ে নূতন জায়গায় গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

রাজা সুদর্শনের পুত্রেরা মহানন্দে বলে উঠলেন, 'আমরা সব শুনলাম। শুনে সুখী হলাম। আমরা যেটি যেমনটি চেয়েছিলাম, সেটি তেমনি হয়েছে।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'এ পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এর পরেও যেন তা হয়।—

সজ্জনেরা মিত্র যেন পান,
লক্ষ্মী যেন পায় সর্বজন।
স্বধর্মেতে করি অবস্থান
রাজবর্গ বসুধাপালন
যেন যত্নে করেন নিয়ত।
নীতি যেন নববধূ-মত
তোমাদের করে তুষ্টিদান।
চন্দ্রচূড় শিব ভগবান
সকলের করুন কল্যাণ।'
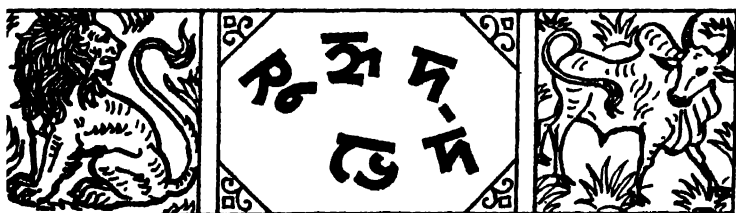
তারপর রাজপুত্রেরা বললেন, 'আর্য, মিত্রলাভ সম্পর্কে তো শুনলাম। এখন মিত্র-ভেদ সম্পর্কে শুনতে ইচ্ছা করছে।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'শোনো তাহলে। 'সুহৃদ্-ভেদ'-এর আদ্য শ্লোকটা হচ্ছে—

বনে সিংহ-বৃষভের প্রীতি চলে বাড়ি;
লোভী খল শৃগালের চালে ঘটে আড়ি।'

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?'

বিষ্ণুশর্মা গল্প সুরু করলেন—

বণিক, বলদ, সিংহ ও শৃগালের গল্প

দক্ষিণাপথে সুবর্ণবতী বলে এক সহর আছে। সেখানে বর্ধমান বলে এক ধনবান্ বণিক বাস করত। তার ধন ছিল প্রচুর; তবু জ্ঞাতি-বন্ধুদের কয়েকজনকে তার চেয়ে বেশী সমৃদ্ধিশালী দেখে তার আরও ধনবৃদ্ধি করার মতি হল। কারণ—

নীচু দিকে চেয়ে কার অভিমান হয় না বর্ধিত?
উপরের দিকে চেয়ে দীনতায় কে নয় পীড়িত?—

বিশেষতঃ—

ব্রহ্মঘাতী পূজা পায় যদি তার বহু ধন থাকে!
জন্মিলেও চন্দ্রবংশে নির্ধনের কে বা খোঁজ রাখে?

এ কথাও ঠিক যে—

যথা কোন প্রমদায় বুড়া স্বামী নাহি চায়,
লক্ষ্মী কভু নাহি যায় দৈবপর কারও ঠাঁই—
অক্লান্ত উত্তম আর সাহস যাহার নাই।

সত্যই—

আলস্য, রুগ্নতা, স্ত্রীরতি, অতি-মায়া স্বদেশের প্রতি,
ভীরুতা, সন্তোষ,—এই ছয় মহত্ত্বের অন্তরায় হয়।

তার কারণ—

অল্প-ধন-প্রাপ্তিতে যে খুশী হয়ে যায়,
দায়মুক্ত বিধি তার ধন না বাড়ায়।

এ কথায় ভুল নাই যে—

নির্বীর্য ও নিরুত্তম, নিরানন্দ, শত্রুদের আনন্দ-কারণ,
হেন পুত্রে কোন নারী গর্ভে যেন না করে ধারণ।

শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে—

অলব্ধের পিছু লাগো ; পেলে যাহা করো তা সঞ্চয়,
বিনিয়োগে বাড়াইয়া পুণ্যকর্মে করো ধন ব্যয়।

যে ধন বাড়ে না, অল্প করে খরচ করলেও কালক্রমে তা চোখের কাজলের মত ক্ষয়ে যায়। আর ভোগ না করা হলে তার থাকা না-থাকা সমান।

কথায় বলে—

কজ্জলের ক্ষয় দেখি, উইদের দেখিয়া সঞ্চয়,
অধ্যয়নে, দানে, কর্মে, দিন তব কর ফলময়।

কারণ—

বিন্দু বিন্দু জল পড়ি ক্রমে ক্রমে ঘট পূর্ণ হয়,
সেই মত বিদ্যা-ধন-ধর্ম-আদি করিবে সঞ্চয়।

এই ভেবে, নন্দক আর সঞ্জীবক বলে দুটি বলদ জুতে, গাড়িতে নানা রকম মাল বোঝাই করে, বর্ধমান বাণিজ্য করতে কাশ্মীরের দিকে চলল। কারণ—

সমর্থের অতিভার কিবা ? উদ্যমীর কিবা অতিদূর ?
বিদেশ কী বিদ্বানের ? পর কেবা যে-জনের বচন মধুর ?

পথ চলতে চলতে, দুর্গম নামে মস্ত বনটাতে পড়ে গিয়ে সঞ্জীবকের জানু ভেঙ্গে গেল। তা দেখে বর্ধমান মনে মনে ভাবল—

নীতিজ্ঞ যে, নানামতো প্রয়াস তাহার ;
ফলাফল থাকে কিন্তু মনে বিধাতার।

কিন্তু—

উদ্‌বেগ সর্বথা হেয় ; সর্ব কর্মে হয় তাহা বাধা।
নিরুদ্‌বেগে সর্বক্ষেত্রে কার্য হয় সহজে সমাধা।

এই ভেবে সঞ্জীবককে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে বর্ধমান বর্মপুর নগরে গিয়ে, সেখান থেকে প্রকাণ্ড আর একটি বলদ এনে জোয়ালে জুতে আবার চলতে লাগল। তারপর থেকে সঞ্জীবক তিন ক্ষুরের উপরে ভর করে সেই বনেই রয়ে গেল। যেহেতু—

হোক জলেতে নিমগ্ন,
পর্বত-ভ্রষ্ট, তক্ষক-দষ্ট,
থাকে কারো পরমায়ু, হয় না সে নষ্ট।

তাছাড়া—

শতশরে বিদ্ধ জীব অকালেতে নাশ নাহি পায়,
প্রাণ তার বাহিরায়, কাল এলে, কুশের খোঁচায়।

তার কারণ—

দেবতা সহায় হলে, অরক্ষিত থাকে ;
দেবতার পরিত্যক্তে সাধ্য কার রাখে ?
বেঁচে রয় অসহায়, হোক বনে বাস ;
আলয়ে লালিত যেবা সেও পায় নাশ।

যত দিন যেতে লাগল, সেই বনে চরে ইচ্ছামত ঘাস-পাতা খেয়ে সঞ্জীবক বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল ; সে গর্জন করে ফিরতে লাগল। এখন, পিঙ্গলক নামে এক সিংহ সেই বনে থেকে নিজ পরাক্রমে রাজ্যসুখ ভোগ করত। কথাই আছে—

পশুগণ করে নাকো অভিষেক কিম্বা সংস্কার,

সিংহ তবু পশুরাজ, ভুজবলে জিত রাজ্য তার।

একদিন সেই সিংহ পিপাসায় আকুল হয়ে জলপানের নিমিত্ত যমুনার তীরে এল। সেখানে সে সঞ্জীবকের ডাক শুনতে পেল। তেমন ডাক সে পূর্বে কখনও শোনে নাই। এ যেন প্রলয়কালের মেঘের গর্জন। সে-ডাক শুনে পিঙ্গলক জলপান না করেই ত্রস্তভাবে নিজের জায়গায় ফিরে চুপ করে ভাবতে লাগল—এটা আবার কী? এ হেন অবস্থায়, তার দুই বন্ধুপুত্র, করটক আর দমনক নামের শৃগাল তাকে দেখল। দেখে দমনক করটককে বলল, 'ভাই করটক, এ কী ব্যাপার, রাজা ম'শয় জল খেতে গিয়ে, না খেয়েই ভয় পেয়ে সরে এলেন?'

করটক বলল, 'আমার মতে এঁর সেবা করাই উচিত নয়। ইনি কেন কি করছেন জেনে কাজ কি? এই রাজা তো দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দুঃখকে অবজ্ঞা করে এসেছেন—

ধনপ্রার্থী সেবকের প্রভু-সেবা দেয় কোন্ ফল?

দেহের স্বাতন্ত্র্যটুকু মূঢ়মতি হারায় কেবল।

সত্যই—

পরাশ্রিত জন যতো শীত-বায়ু-তাপকষ্ট সয়,

তপে তার অর্ধ দিয়া বুদ্ধিমান মহাসুখী হয়।

এটা ঠিক যে—

স্বাধীন জীবিকা যার জীবন সার্থক তার।

গোলাম 'জীবিত' হলে মৃত বলি কারে আর?

এ তো জানা কথা—

'এসো'-'যাও', 'বসো'-'ওঠো', 'বলো'-'থাকো চুপ'—

হায়! হায়! হায়!

আশা-রাহুগ্রস্ত যত প্রার্থীরে ধনীরা

এমনি নাচায়।

হায় রে!—

আশাবদ্ধ মূঢ় সব—পণ্যনারী প্রায়—
অপরের ভোগ লাগি আপনা সাজায়।

দেখা যায়—

প্রভুর চঞ্চল দৃষ্টি পড়িলেও অস্থানে-কুস্থানে
সে-দৃষ্টি-প্রসাদ-লাভ সেবকেরা ভাগ্য বলি মানে।

বিশেষ করে—

উন্নতি-আশায় নতি, প্রাণত্যাগ জীবিকার তরে,
সুখ লাগি দুঃখ-ভোগ, মূর্খ যত সেবকেই করে।

তা ছাড়া—

ভৃত্য যদি চুপচাপ থাকে, মূর্খ বলি ভাবে প্রভু তাকে।
ভৃত্য যদি বাক্যপটু হয়, প্রভু ভাবে এ-বেটা নিশ্চয়
বহুভাষী অথবা পাগল ; নাই এর মুখের আগল।
ভৃত্য যদি মুখ বুজে সয়, প্রভু তারে ভীরু ধরে লয়।
ভৃত্য যদি সহিতে না পারে, নীচজাতি, প্রভু ভাবে তারে।
ভৃত্য যদি কাছে কাছে থাকে, প্রভু ধৃষ্ট মনে করে তাকে।
ভৃত্য যদি দূরে দূরে রয়, প্রভু-চক্ষে অকেজো সে হয়।
সেবা-ধর্ম পরম গহন বোঝে না তা যোগীদেরও মন।'

দমনক বলল, 'এমন কথা মনে করাও ঠিক নয়। কারণ—

যতনেতে প্রভু-সেবা না-করার হেতু কিবা হয় ?
যাঁহারা সন্তুষ্ট হলে, মনস্কাম পূরান: নিশ্চয় ?

তা ছাড়া—

প্রভু-সেবা না থাকিলে, কিভাবে সম্ভব
রাজার ও শ্বেতছত্র, সৈন্য, হাতীঘোড়া,
চামর-বীজিত তাঁর যতেক বিভব ?'

করটক বলল, 'তা হোক্, আমাদের এই অনধিকার-চর্চায় কাজ কি ? যে-বিষয় আমাদের অধিকারের বাইরে, তাতে নাক না-গলানোই সব দিক দিয়ে ভাল। দেখ—

অনধিকারেও চেষ্টা যেই জন করে,
অচিরে শায়িত হয় ভূমির উপরে।
গোঁজ উঠাইয়া যথা মরিল বানরে।'

দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ?'

করটক বলতে লাগল—

বানরের কীলক তোলার গল্প

মগধদেশে ধর্মারণ্যের কাছাকাছি এক জায়গায় শুভদত্ত নামে একজন কায়স্থ একটা বিহার তৈরি করাচ্ছিলেন। সেখানে সূত্রধর দীর্ঘ একটা গাছের গুঁড়ি করাত দিয়ে চিরতে চিরতে, কিছুদূর-চেরা ঐ কাঠের মধ্যে একটা গোঁজ পুঁতে রেখেছিল। বনের বানরদের একটা বৃহৎ দল সেখানে খেলা করতে এল। তাদের একটি, যেন মরবার জন্যই, দু'হাত দিয়ে গোঁজটাকে ধরে বসে পড়ল। ফলে, তার লম্বমান অণ্ডকোষদুটি চির-দেওয়া কাঠটার ভিতর ঢুকে গেল। বানরজাতির স্বভাব হচ্ছে চঞ্চল ; সেই চঞ্চলতার বশে সে গোঁজটি ধরে বেশ জোরে টান দিতে লাগল। তার টানাটানিতে গোঁজ উঠে এল, আর বানরটির অণ্ডকোষদুটি একেবারে চিপ্‌সে যাওয়ায় সেটা মারা পড়ল।

এই জন্যই বলছিলাম—

বিনা অধিকারে চেষ্টা যেই জন করে,
শায়িত হয় সে শীঘ্র ভূমির উপরে।

দমনক বলল, 'প্রভু কী করতে চাইছেন সেটা জানা তো সেবকদের কর্তব্য।'

করটক বলল, 'সব কিছু দেখা-শোনার ভার যাঁর উপর, সেই প্রধানমন্ত্রীই তা জানুন গে। অন্যের অধিকার নিয়ে মাথা-ঘামানো

কোন সেবকের উচিত নয়। দেখ—

হোক না সে প্রভুরই কারণ,
পর-কর্ম করে যেই জন,
দুঃখ তার ভাগ্যের লিখন।
প্রভু-হিতে চীৎকারিয়া
মারা পড়ে গর্দভ যেমন।'

দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কেমন?'

করটক গল্প সুরু করল—

রজক চোর গাধা আর কুকুরের গল্প

বারাণসীতে কর্পূরপট নামে এক রজক ছিল। এক রাত্রে সে তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ জেগে থাকবার পর গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল। সেই ফাঁকে এক চোর জিনিষপত্র চুরি করবার জন্য তার বাড়ীতে ঢুকল। তার বাড়ীর প্রাঙ্গণে তার গাধাটা বাঁধা ছিল; কুকুরটাও সেখানে বসে ছিল। চোরকে দেখে গাধা কুকুরকে বলল, 'ভাই, এ তোমার ব্যাপার; তবে চীৎকার করে তুমি প্রভুকে জাগিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

কুকুর বলল, 'ম'শয়, আমার কাজ নিয়ে আপনার মাথা ঘামানো উচিত নয়। আপনি কি জানেন না যে, আমি দিবা-রাত্র বাড়ী পাহারা দিয়ে থাকি। অনেকদিন ইনি নিরুপদ্রবে আছেন; তাই আমার প্রয়োজন ইনি বোঝেন না। এই কারণে, আজকাল আমাকে খেতে দেওয়ার সম্পর্কে এঁর বিশেষ গরজ দেখি না। ঠেকায় না পড়লে প্রভুরা তাঁদের সেবকদের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন।'

গাধা বলল, 'ওরে বেটা, শোন—

কার্যকালে স্বার্থ খোঁজে, কেমন বন্ধু, কেমন সেবক সে?'

কুকুর বলল—

'কেমন প্রভু দেখে না যে সেবকগণে, কাজটি বাগিয়ে?

কথায় বলে—

প্রভু-সেবা অথবা সে আশ্রিত-পালন,
ধর্ম-অনুষ্ঠান কিম্বা পুত্র-উৎপাদন,
প্রতিনিধি দিয়া নাহি হয় সম্পাদন।'

তা শুনে গাধা রেগে গেল। সে বলল, 'ওরে শয়তান! তুই ঘোর পাপী, তাই এই বিপত্তির সময় প্রভুর কার্যে অবহেলা করছিস্। বেশ, প্রভু যাতে জেগে ওঠেন তার ব্যবস্থা আমিই করছি। কারণ—

পিঠ দিয়া রৌদ্র-সেবা, পেট দিয়া অগ্নি-সেবা,
প্রভুসেবা সর্বভাবে বিহিত নিশ্চয়।
পরলোক-সেবা তরে অ-মায়ায় করিবে আশ্রয়।'

এই বলে সে জোরে চীৎকার করে উঠল। সেই চীৎকারে রজকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় সে ভীষণ চটে গিয়ে, বিছানা থেকে উঠে, গাধাটাকে লাঠি দিয়ে খুব প্রহার করল। প্রহারের ফলে গাধা পঞ্চত্ব পেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

পরকর্ম করে যেই জন
দুঃখ তার ভাগ্যের লিখন।

দেখ, শিকারের পশু সন্ধান করাই হল আমাদের কাজ; তার জন্যই আমরা নিযুক্ত। সেই কাজই করা যাক।' একটুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে করটক আবার বলল, 'আজ সেটাও করবার প্রয়োজন নাই; প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য এখনও আমাদের প্রচুর রয়েছে।'

দমনক রেগে গিয়ে বলল, 'শুধু পেটের জন্যই রাজ-সেবা কর না কি? এটা তোমার উপযুক্ত কথা হল না। কারণ—

বন্ধু-উপকার আর শত্রু-নির্যাতন তরে
এ জগতে রাজাশ্রয় বিজ্ঞে বাঞ্ছা করে।
উদরপূরণমাত্র করে যে ইতরে।

তা ছাড়া—

কে বাঁচে নিজের তরে ?
বাঁচে, যেবা বাঁচলে পরে
ব্রাহ্মণ ও সুহৃৎ স্বজন—
ধন্য তারই সফল জীবন।

দেখ— পাঁচ কাহনেই কেউ বা গোলাম হয়,
কেউ বা লক্ষে ; লক্ষেও কেউ নয়।

এটাও দেখ—

মানুষে মানুষে ভেদ নাই। দাসত্ব তো নিন্দনীয় তাই।
দাস হয়ে, শ্রেষ্ঠ যেবা নয়, জীব বলি গণ্য সে কি হয় ?

এ কথাও বলা হয় যে—

হাতী ঘোড়া, লৌহ কাঠ, কাপড় পাথর
মেয়ে মর্দ, জল—এরা ভিন্ন পরস্পর।
সামান্য সে ভেদ নয়—বিস্তর, বিস্তর।

ঐ রকম—

স্নায়ু-চর্বি আছে কিছু, মাংস নাই, যে-অস্থি এমন—
ক্ষুধা-শান্তি না হলেও, তুষ্ট তাতে কুক্কুরের মন।
কোলের শৃগাল ছাড়ি সিংহ, দেখ, গজ-পিছে ধায়।
কষ্ট হোক, আপনার বীর্য-যোগ্য ফলই সবে চায়।

এদিকে সেব্য সেবকের মধ্যে প্রভেদটা দেখ—

কুকুর প্রভুকে দেখে লাঙ্গুল নাচায়,
পায়ের উপরে পড়ে গড়াগড়ি যায়,
হাঁ-করে দেখায়ে পেট, বুভুক্ষা জানায় ;
হাতী কিন্তু, প্রভু এলে মিটিমিটি চায়,
বহু তোষামোদ শোনে, তার পরে খায়।

এ-কথা খুবই সত্য যে—

বিজ্ঞান বিক্রম কীর্তি-যুক্ত যে জীবন,
ভুবন-প্রথিত যাহা,—হোক ক্ষণস্থায়ী

তারেই জীবন কহে বিজ্ঞ যেই জন।
কাকও চিরায়ু, যার কর্মই ভোজন।

এও সত্য—

পুত্র বন্ধু ভৃত্য হোক, হোক গুরুজন—
কারও প্রতি দৃষ্টি নাই, দীনে নাই দয়া,
মনুষ্যজগতে তার বিফল জীবন।
কাকও চিরায়ু, যার কর্মই ভোজন।

এটাও—

হিতাহিত বিচারের বুদ্ধি নাই যার
নাম শোনা মাত্র লোকে অবজ্ঞা জানায় ;
জঠর-পূরণমাত্র করেছে যে সার,
তার ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?'

করটক বলল, 'আমরা তো বড় কর্তা নই। প্রভু কেন কি করছেন না-করছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের লাভ কি ?'

তা শুনে দমনক আবার বলল, 'ভাইরে, কাজের গুণেই কিছুদিনের মধ্যে মন্ত্রী প্রধান বা অপ্রধান হয়ে যায়। কারণ—

এ জগতে কেহ কারও স্বভাবতঃ নয়।
উদার আদৃত হয়, খলজন ঘৃণা পায়,
কর্মগুণে লঘু গুরু মানুষ নিশ্চয়।

দেখ— পাহাড় বেয়ে পাথর তোলায় কষ্ট বহু হয় ;
কষ্ট নাইকো ফেলতে নীচে তায়।
আত্মোন্নতির পথে তেমনি কষ্ট অতিশয়।
পাপের পথে বন্ধক কোথায় ?

তাই বলছি—সকলেরই আত্মা হচ্ছে নিজের চেষ্টার অধীন

নিজ কর্মদোষে নর কূপ-খনকের প্রায়
ক্রমশই নেমে যায়।
নিজ কর্মগুণে নর প্রাচীর-কারের প্রায়,
ক্রমশই উঠে যায়।

করটক বলল, 'তা হলে তুমি কি বল ?'

দমনক বলল, 'প্রভু পিঙ্গলক কিসের ভয়ে জল না খেয়েই এমন সন্ত্রস্ত ভাবে ফিরে এসে বসলেন ?'

করটক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তা বুঝলে কি করে ?'

দমনক উত্তর দিল, 'যাদের তীক্ষ্ণ বোধশক্তি আছে তাদের কি কিছু অজানা থাকে ? লোকে বলে—

বায়ুর নাইকো গতি যেথা,
সূর্যকিরণ বিফল ফেরে,
বুদ্ধিমানের বুদ্ধি সেথা
অনায়াসেই প্রবেশ করে।

দেখ— পশুরও বোধের গম্য সুস্পষ্ট বিষয় ;
চালকের আদেশেই হাতী-ঘোড়া চলে।
অকথিত অভিপ্রায় বিজ্ঞে বুঝে লয় ;
পরের ইঙ্গিত ধরা যায় বুদ্ধিবলে।

জান তো—

আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা ও বচন,
চোখের মুখের অতি-ঈষৎ বিকৃতি ;
প্রাজ্ঞজনের কাছে করে উদ্‌ঘাটন
গূঢ়তম মানসের আকৃতি প্রকৃতি।

দেখে নিও, এই ভয়ের সূত্র ধরে বুদ্ধিবলে এঁকে আমার বশে আনব।

কারণ— প্রসঙ্গ বুঝে কথা যেবা কয়,
আচরণ বুঝে করে যে প্রণয়,
সামর্থ্য বুঝে কোপ যে দেখায়—
সে জন পণ্ডিত জেন সুনিশ্চয়।'

করটক বলল, 'বন্ধু, স্বামীসেবা কিভাবে করতে হয় তুমি জান না।

দেখ— না ডাকিতে যেই সেবক আসে,
না পুছিতে যেবা বহুল ভাষে,
অন্তরে ভাবে, বুঝি নরপতি

প্রীত হয়েছেন তাহার প্রতি,
সে ভৃত্য হায়! নির্বোধ অতি।'

দমনক বলল, 'আমি স্বামীসেবা জানিনা কী রকম? দেখ—

আছে কিছু স্বভাবে সুন্দর?
কিম্বা অসুন্দর?
যার যা'তে রুচি, তাই তার
হয় প্রীতিকর।

সুতরাং— মানুষের ভাব বুঝে তালে তাল দিয়া বিজ্ঞজন,
সে-মানুষে অচিরেই এনে ফেলে বশেতে আপন।

স্বামীসেবার রহস্য শুনবে? শোন—

'কে আছিস্?' 'এই আমি; আজ্ঞা দিন কিবা প্রয়োজন?'
এই মত যথা শক্তি রাজ-আজ্ঞা করিবে পালন।

শাস্ত্রে আছে—

অল্পেতে তুষ্ট থাকে, ধৈর্য ও বুদ্ধি রাখে,
সদাই যে অনুগত— প্রভুর ছায়ার মত.
আজ্ঞা পেলে করে না বিচার,
রাজ-গৃহে থাকা সাজে তার।'

করটক বলল, 'অসময়ে কাছে যাওয়ার জন্য কখনো কখনো প্রভু তোমাকে অপমান করেন।'

দমনক বলল, 'তা হোক, যারা যাঁর খায়, তাঁর কাছাকাছি থাকা তাঁদের অবশ্যই উচিত। যেহেতু—

ক্ষতি-ভয়ে কাজ ফেলে রাখা ভীরুর লক্ষণ।
ছাড়ে কেউ অজীর্ণ রোগের শঙ্কায় ভোজন?

দেখ— যত মূর্খ হোক যত ছোটলোক,
অপ্রিয় বা অতি, কাছে যদি রয়,
তারেই নৃপতি করেন আশ্রয়।
লতা ও যুবতী, তথা ভূমিপতি,
পাশে যারে পায় তারেই জড়ায়।'

করটক বলল, 'ভাল কথা, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে কি বলবে?'

দমনক বলল, 'শোন, প্রথমতঃ প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন সেটা জানতে হবে।'

করটক বলল, 'তা জানা যাবে কী দিয়ে? অপ্রসন্ন প্রসন্ন জানবার লক্ষণ কি?'

দমনক বলল, 'শোন—

দূর হতে সেবকেরে দৃষ্টি-কৃপা দান,
দেখিয়া কুশল প্রশ্ন, সহাস্য-বদন,
পরোক্ষেও সেবকের গুণের ব্যাখ্যান,
প্রিয়বস্তু দেখি সেই সেবকে স্মরণ,
সে-সেবকে অনুরাগ অনুগ্রহ দান,
দোষ উপেক্ষিয়া তার গুণটি গ্রহণ,
প্রভু যে প্রসন্ন, তার এসব লক্ষণ।

আর— 'দিব দিব' বলি শুধু সময়-যাপন,
তৃষ্ণা বাড়ানো আর কৃত কার্য অস্বীকার—
প্রভু যে বিরক্ত তার নিশ্চিত লক্ষণ।

প্রভু প্রসন্ন না অপ্রসন্ন জানার পর, তাঁকে যে-ভাবে আমার বশে আনা যাবে, সেইভাবে কথা বলব। কারণ—

এই পথে গেলে কোন্ বিপত্তির ভয়,
ওই পথে গেলে কেন সাফল্য নিশ্চয়,
নীতিশাস্ত্র-অনুযায়ী তাহার প্রমাণ
প্রভুর সমীপে স্পষ্ট করেন ধীমান।

পুনশ্চ— প্রভুর মনের ভাব ত্রিবিধ নিশ্চয়—
প্রীত হলে, সেবকের দোষ দোষ-ই নয়;
বিরক্ত হইলে তার গুণও দোষ হয়;
নিরপেক্ষ, দোষ দোষই, গুণ গুণই রয়।'

করটক বলল, 'তবু বলার সুযোগ না পেলে তো তোমার বলা উচিত হবে না। কেন না—

বৃহস্পতিও যদি কথা কন না হতে সময়,
বুদ্ধি তাঁরও অবজ্ঞাত তিরস্কৃত হইবে নিশ্চয়।'

দমনক বলল, 'বন্ধু, ভয় নাই, সুযোগ না পেয়ে আমি কথা বলব না। কেন না—

প্রভুর আপদে, তাঁর উন্মার্গযাত্রায়
কার্যকাল-অতিপাতে আর,
প্রভুহিতকামী ভৃত্য বিনা জিজ্ঞাসায়
বলে যেন বক্তব্য তাহার।

সুযোগ পেয়েও যদি আমার পরামর্শ আমি না দিই, তাহলে তো আমার মন্ত্রিত্বই নিরর্থক। কারণ—

যে গুণের দ্বারা হয় বৃত্তি নিরূপিত,
যার জন্য সমাদর করে সাধুগণ,
সেই গুণই গুণবাচ্য ; কর্তব্য গুণীর
সযত্ন রক্ষণ তার, তার সম্বর্ধন।

তাই বলছি, অনুমতি দাও, আমি পিঙ্গলকের কাছে যাই।'

করটক বলল, 'কল্যাণ হোক, যা অভিপ্রেত হয় করো—

অর্থ, উন্নতি, বিজয় আর শত্রুপক্ষ-ক্ষয়—
এ-সব অভীষ্ট সাধি ফিরে এস ভালয় ভালয়।'

তারপর দমনক মহা বিস্ময়ের ভাণ করে পিঙ্গলকের কাছে গেল। দূরে থাকতেই রাজা তাকে আসতে দেখলেন, আদর করে কাছে ডাকলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দমনক তাঁর কাছে গিয়ে বসল।

রাজা বললেন, 'বহুকাল পরে যে!'

দমনক বলল, 'আমার মত সেবককে দিয়ে মহারাজের যদি কোন প্রয়োজন নাও থাকে, তবু, আপনার নুন খাই আমি, আপনার কাছে আসা আমার কর্তব্য, তাই এলাম। কারণ—

তৃণ, তারও আছে প্রয়োজন রাজার সেবায়—
তাঁর দন্তের শোধনে তাঁর কর্ণ-কণ্ডূয়নে।
হস্ত-বাক্-যুক্ত জীব তুচ্ছ হবে তার তুলনায়?

দীর্ঘকাল আপনা কর্তৃক আমি অবজ্ঞাত হয়েছি বলেই মহারাজের যদি এরকম আশঙ্কা হয়ে থাকে যে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবে তাও নয়। কেন না—

অবজ্ঞা পেলেও, যদি ধর্মশীল হয়,
বুদ্ধিবিলোপের কোনো নাহি থাকে ভয়।
অগ্নিকে যদিও ধরি নিম্নমুখী করে
শিখা তার সর্বদাই উঠিবে উপরে।

মহারাজের এ সব জিনিষ ভাল ভাবেই জানা উচিত। কারণ—

মণি পায়ে লোটে ; কাচ শিরে ওঠে ;
কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় বেলায়
মণি সে মণিই, কাচ কাচই থেকে যায়।

এ-কথাও ঠিক যে—

রাজা যদি গুণাগুণে ভেদ নাহি করে,
গুণী-নির্গুণ প্রতি সমান আচরে,
উৎসাহ-উদ্যম কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে ?

এটাও সত্য যে—

উত্তম, মধ্যম, অধম— তিনবিধ লোক ;
গুণ-অনুরূপ কর্মে উচিত নিয়োগ।

এও বড় খাঁটী কথা যে—

যথাস্থানে রাখা চাই ভৃত্যে ও ভূষণে।
নূপুর মাথায় পরে ? মুকুট চরণে ?

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভাল যে—

যে মণির শোভা খোলে স্বর্ণ-অলঙ্কারে
তারে নিয়ে যদি কেউ সীসকে বসায়,
কাঁদে নাকো মণি, তার দ্যুতিও না যায় ;
সকলেই নিন্দে শুধু সেই মণিকারে।

এটাও— মুকুটে বসালে কাচ, রতন নূপুরে ;
দূষে কি রতনে ? দূষে অজ্ঞ সে-সাধুরে।

দেখুন— এটি বুদ্ধিমান্, অনুরক্ত ওটি, এটি বলবান্, ওটি থেকে ভয়—
ভৃত্যগুণ-বিচারনিপুণ রাজাদের ভৃত্য হতে বুদ্ধিলাভ হয়।

আরও দেখুন—

অশ্ব, শস্ত্র, শাস্ত্র বীণা বাণী নর নারী আর
আশ্রয়ে যাহার থাকে গুণাগুণ পেয়ে যায় তার।

ভেবে দেখুন—

কি লাভ অকেজো ভক্তে ?
সে-কেজোতে লাভ কিবা যে খোঁজে অহিত ?
ভক্ত ও সমর্থ আমি ;
এ-অধমে অবহেলা হয় কি উচিত ?

কারণ— রাজ-অবজ্ঞার ফলে পরিজন তাঁর মতিভ্রষ্ট হয় ;
তাদের বাহুল্য হলে, পণ্ডিতেরা দূরে দূরে রয় ;
পণ্ডিত-বর্জিত রাজ্যে রাজনীতি দুষ্ট হয়ে যায় ;
দূষিত নীতির হেতু সারা রাজ্য অবশ ঝিমায়।

মহারাজ এ কথা তো মিথ্যে নয় যে—

নৃপতি-পূজিত যেবা, দেশবাসী তারে পূজা করে ;
রাজ-অবজ্ঞাত হলে শ্রদ্ধা কেবা রাখে তার 'পরে ?

আমার মত সামান্য একজন বলছে বলেই এ-কথা ফেলবার নয়। কারণ—

বালকেরও ন্যায়বাক্য মনীষীরা করেন গ্রহণ।
প্রদীপে দেয় না আলো সূর্য যবে অগোচর হন ?'

পিঙ্গলক বললেন, 'ভদ্র দমনক, ব্যাপারটা কি ? তুমি হলে আমার প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, একজন পণ্ডিত লোক ; কোন খলের কথা শুনে তুমি এতকাল এদিকে আস নাই ? এখন তোমার মনের কথাটি কি বল তো ?'

দমনক বলল, 'কিছু জিজ্ঞাসা করব, বলবেন কি ? মহারাজ জলপান করতে গিয়ে, পান না-করেই কেন এখানে এসে বিমূঢ়ের মত বসে আছেন ?'

পিঙ্গলক বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি ; এই রহস্যটা যাকে বলতে পারি এমন বিশ্বাস্যপাত্র কেউ নাই। তবে, তুমি আছ বটে। তাহলে শোনো, বলছি—সম্প্রতি এই বনে অপূর্ব এক জীবের আবির্ভাব হয়েছে, সুতরাং এ বন আমাদের ছাড়তে হবে। একটা অপূর্ব মহাশব্দ তুমিও শুনে থাকবে ; যে রকম শব্দ, তাতে ঐ জীবটার বলও অতি বেশী হওয়া উচিত।'

দমনক বলল, 'মহারাজ তাহলে তো বড় ভয়ের কারণ। সে-শব্দ আমরাও শুনেছি। কিন্তু, যে-মন্ত্রী কোনরূপ মন্ত্রণা না করেই প্রথমে দেশ-ত্যাগ বা যুদ্ধের আয়োজন করতে উপদেশ দেয়, সে কেমন মন্ত্রী ? তা ছাড়া মহারাজ, এই কর্তব্য স্থির করার সময়েই তো ভৃত্যদের যোগ্যতা বোঝা যায়। কারণ—

পত্নী-বন্ধু-সেবকবর্গের সেই সঙ্গে অবশ্য নিজের
বল-বুদ্ধি কত, বোঝা যায় আপদের নিকষ-শিলায়।'

সিংহ বললেন, 'ভদ্র, আমার খুবই ভয় লাগছে।'

দমনক মনে মনে ভাবল : নইলে আমার কাছে কেন রাজ্যসুখ ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কথা বলছেন ? প্রকাশ্যে বলল, 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ ভয় করবেন না। তবে করটক ইত্যাদিকেও আশ্বাস দিন ; কারণ আপদের প্রতিকারের জন্য লোকের সমবায় বড় একটা দেখা যায় না।'

রাজা পিঙ্গলক দমনক ও করটককে রত্ন-অলঙ্কার প্রভৃতি মহাপ্রসাদ দিয়ে খুশী করবার পর, তা'রা ভয়ের প্রতিকারের প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে এল। যেতে যেতে করটক দমনককে বলল, 'ভাই, ভয়ের কারণটা দূর করা যাবে কি যাবে-না, না-জেনেই ভয়ের উপশম করার প্রতিজ্ঞা করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাটা কি ঠিক হল ? কারণ, উপকার না করেই কারও উপহার নেওয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ রাজার উপহার। দেখ—

লক্ষ্মী র'ন যাঁহার প্রসাদে, পরাক্রমে যাঁহার বিজয়,
ক্রোধে যাঁর মৃত্যুর বসতি, তিনিই তো সর্বতেজোময়।

কথাই আছে—

শিশু হোন্, রাজারে মনুষ্য-ভাবা তাঁর অবমান,
নর-রূপে এ জগতে তিনিই তো দেবতাপ্রধান।'

দমনক একটু হেসে বলল, 'বন্ধু, উতলা হয়ো না। ভয়ের কারণটি আমার জানা—সেটা হচ্ছে বলদের গর্জন! বলদ যে আমাদের ভক্ষ্য, সিংহের তো বটেই।'

করটক বলল, 'তাই যদি হয়, প্রভুর ভয় ওইখানেই ভেঙ্গে দিলে না কেন?'

দমনক বলল, 'ওইখানেই ভয় ভেঙ্গে দিলে আমাদের মহাপ্রসাদ লাভ হত কি করে? তা ছাড়া—

প্রভুকে নিশ্চিন্ত-করা ভৃত্যদের কখনও হয় না উচিত।
প্রভুকে নিশ্চিন্ত করে দধিকর্ণের বলো হল কোন্ হিত?'

করটক জিজ্ঞাসা করল, 'সে কেমন?'

দমনক গল্প সুরু করল—

সিংহ, বিড়াল ও ইঁদুরের গল্প

উত্তরের দিকে অর্বুদশিখর নামে এক পর্বত আছে। সে পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক মহা পরাক্রান্ত সিংহ থাকত। সে যখন তার পার্বত্য গুহায় শুয়ে থাকত, একটা ইঁদুর এসে প্রতিদিন তার কেশরের অগ্রভাগ কেটে কেটে যেত। সিংহ তার কেশরাগ্র ছাঁটা যাচ্ছে বুঝে ক্রুদ্ধ হত; কিন্তু ইঁদুর গর্তে ঢুকে পড়ায়, তাকে ধরতে পারত না। সিংহ ভাবতে লাগল, এ রকম ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভালো মনে পড়েছে, শোনা যায়—

ক্ষুদ্র শত্রু হলে তারে পরাক্রমে যায় নাকো ধরা।
ধরিতে তাহাকে চাই, তারই তুল্য সৈন্য খাড়া করা।—

এই বিচার করে সে গ্রামে গিয়ে দধিকর্ণ নামে একটা বিড়ালকে

আদর করে নিয়ে এল ; তাকে মাংসাদি খাইয়ে সন্তুষ্ট করে নিজের গুহায় রেখে দিল।

বিড়ালটার ভয়ে ইঁদুর তার গর্ত থেকে বাইরে বার হত না, সিংহও অক্ষত কেশরে সুখে নিদ্রা যেত। যখনই ইঁদুরের শব্দ শুনত, তখনই সে বিড়ালকে মাংস খাইয়ে আদর জানাত।

একদিন ইঁদুরটা ক্ষুধার জ্বালায় বাইরে এসে গিয়েছিল ; বিড়ালটা তাকে ধরে, মেরে খেয়ে ফেলল। এরপর থেকে সিংহ আর কখনও ইঁদুরের শব্দ না পেয়ে, বিড়ালের আব কোন প্রয়োজন না পড়ায়, তাকে খেতে দেওয়ার ব্যাপারে শিথিল হয়ে পড়ল।

এই জন্যই বলছিলাম—

প্রভুকে নিশ্চিন্ত-করা ভৃত্যদের কখনও হয় না উচিত।'

তারপর দমনক আর করটক সঞ্জীবকের কাছে চলল। সেখানে গিয়ে করটক এক গাছের তলায় বেশ দম্ভভরে বসে পড়ল। আর দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বলল, 'আরে বল্‌দা, এই আমি রাজা পিঙ্গলকের দ্বারা বন রক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়েছি। সেনাপতি করটক তোকে আদেশ জানাচ্ছেন, হয় সত্বর তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হ', নয় তো এই বন থেকে সরে পড়। নচেৎ তোর ভাগ্যে দুঃখ আছে। প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে কি যে করবেন, কে জানে ?'

এ কথা শুনে সঞ্জীবক তখনই এসে গেল। কারণ—

নৃপতির আজ্ঞা ভঙ্গ, ব্রাহ্মণের প্রতি অসম্মান,
রমণীর ভিন্ন-শয্যা—বিনা-অস্ত্রে বধের সমান।

সঞ্জীবকের দেশাচার জানা ছিল না, সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে করটককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। কথায় বলে—

'বুদ্ধি বড় বল-চেয়ে। হাতীর যে এই দশা,
হেতু তার বুদ্ধি নাই।'
তার-ই পিঠেতে বসা মাহুতের তাড়া খেয়ে
ঢেঁড়া যেন বলে তাই।

সঞ্জীবক সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সেনাপতি ম'শয়, আমায় কি করতে হবে, আজ্ঞা হোক।'

করটক বলল, 'দেখ বলদ, তোমার যদি এই বনে থাকার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এখনই গিয়ে মহারাজের চরণপদ্মে প্রণাম করো।'

সঞ্জীবক বলল, 'আমাকে অভয় দিন, যাচ্ছি।'

করটক বলল, 'ওরে বেটা বল্‌দা, শোন্‌, তোর এই ভয় হচ্ছে অনর্থক। কারণ—

চেদীরাজ শিশুপাল দিয়ে যান শাপ,
কেশব করেন নাকো তার প্রতিবাদ।
সিংহ সাড়া দেয় শুধু মেঘের গর্জনে,
গ্রাহ্য কভু করে না সে শৃগাল-নিনাদ।

তা ছাড়া—

প্রভঞ্জন উন্মূল না করে তৃণদল,
সর্বথা প্রণত যারা, একান্ত কোমল;
উচ্চশির বৃক্ষে কিন্তু উপাড়িয়া যায়।
প্রবল প্রবলকেই বিক্রম দেখায়।'

তারপর করটক আর দমনক সঞ্জীবককে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে পিঙ্গলকের কাছে গেল। রাজা পিঙ্গলক তাদের প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করলেন। তা'রা দুজন তাঁকে প্রণাম করে, বসল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে দেখলে?'

দমনক বলল, 'মহারাজ, দেখলাম। মহারাজ যেমন শুনেছেন ঠিক তাই। সে মহাবল, মহারাজকে সে দেখতে চায়। সুতরাং আপনি তৈরি হয়ে বসুন। তবে কিনা, শব্দমাত্রই ভয় পেলে চলবে না। কারণ—

স্রোতবেগে আল যায় ভেসে, না চাপিলে মন্ত্র যায় ফেঁসে,
স্নেহ ভেঙে পড়ে খলতায়, ভীরু ভাঙে বচনেরই ঘায়।

কথায় বলে—

শব্দ-হেতু নাহি বুঝি শব্দমাত্রে ভয়
উচিত না হয়।
শব্দের কারণ খুঁজি কুট্‌নী বুড়ীটায়
কত মানই পায় !'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে আবার কি ?'

দমনক গল্প সুরু করল—

কুট্‌নী ও ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষসের গল্প

শ্রীপর্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নামে একটা নগর আছে। সেখানে পর্বতচূড়ায় ঘণ্টাকর্ণ বলে এক রাক্ষস থাকে,—এইরকম জনপ্রবাদ শোনা যেত। একদিন এক চোর ঘণ্টা চুরি করে পালানোর সময় এক বাঘের হাতে মারা যায়। ঘণ্টাটা তার হাত থেকে পড়ে গেলে বানররা সেটা তুলে নেয়। বানরগুলি সর্বক্ষণ ঐ ঘণ্টাটা বাজাত। নগরের লোকেরা দেখল, একটা মানুষকে কে খেয়ে গিয়েছে ; তা'রা শুনল, প্রতিক্ষণ কে ঘণ্টার শব্দ করছে। 'ঘণ্টাকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষ খাচ্ছে আর ঘণ্টা বাজাচ্ছে' এই বলে তা'রা নগর ছেড়ে পালাতে লাগল।

করালা নামে এক কুট্‌নীর মনে হল ঃ এই ঘণ্টাধ্বনির বিরাম নাই, মর্কটগুলি ঘণ্টা বাজাচ্ছে না ত ? সে নিজে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে রাজাকে গিয়ে জানাল, 'মহারাজ, কিছু অর্থব্যয় করেন তো আমি এই ঘণ্টাকর্ণকে শেষ করে দিই।'

রাজা খুশী হয়ে তাঁকে ধন দিলেন। কুট্‌নীও হলুদগুঁড়ো প্রভৃতি পাঁচ রঙের গুঁড়ো দিয়ে নানা মণ্ডল এঁকে গণেশাদি-পূজার ঠাট দেখিয়ে, নিজে বানরদের প্রিয় নানা ফল সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়ে ঢুকল। সেখানে সে ফলগুলি ছড়িয়ে দিল। তার ফলে বানররা ঘণ্টা ফেলে রেখে, ফল কুড়োতে তৎপর হল। কুট্‌নী এই ফাঁকে ঘণ্টাটা হাতিয়ে নগরে ফিরে এল। সেই থেকে সকলেরই সে পূজ্যা হয়ে গেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

শব্দ-হেতু নাহি বুঝি শব্দমাত্রে ভয় উচিত না হয়।'

তারপর সঞ্জীবককে এনে দর্শন করানো হল। সেই থেকে সে ঐ বনে সিংহের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে অনেক কাল বাস করল।

একদিন সেই সিংহের ভাই স্তব্ধকর্ণ নামে আর সিংহ সেই বনে এল। তার আতিথ্য করে, তাকে বসিয়ে, পিঙ্গলক তার আহারের জন্য পশু বধ করতে চলল। এমন সময় সঞ্জীবক বলল, 'মহারাজ, আজ যে-সব হরিণ মারা হয়েছে, তাদের মাংসটা কোথায় গেল ?'

রাজা বললেন, 'দমনক আর করটকই জানে।'

সঞ্জীবক বলল, 'তার কিছু আছে কী নাই—খোঁজ নেওয়া হোক।'

সিংহ হেসে বললে, 'তা নাই-ই, ধরো।'

সঞ্জীবক বলল, 'ওরা এতটা মাংস খেল কি করে ?'

রাজা বললেন, 'কিছু খেয়েছে, কিছু দিয়েছে, কিছু নষ্ট করেছে। প্রত্যহই এমনি হচ্ছে।'

সঞ্জীবক বলল, 'এসব মহারাজের অগোচরেই করে নাকি ?'

রাজা বললেন, 'আমাকে না জানিয়েই করে।'

সঞ্জীবক বলল, 'এ তো ঠিক নয়। কারণ—

আপদের প্রতিকার ছাড়া অন্য কোন ধরণের কাজ
প্রভুর অজ্ঞাতে করা অনুচিত গণ্য, মহারাজ।

এ কথাও সত্য যে—

ছাড়ে অল্প, নেয় বেশী—কমণ্ডলু হেন—
হয় যেবা অমাত্য রাজার।
ক্ষণে তুচ্ছ গণে মূর্খ ; দরিদ্র সে-জন
কপর্দকে অবহেলা যার।

এ-কথাও মিথ্যা নয়—

শ্রেষ্ঠ অমাত্য সেই, কপর্দকও আনি যেবা বাড়ায় ভাণ্ডার,
ধনীর ভাণ্ডারই প্রাণ ; প্রাণ ব'লে ভূপতির নাই কিছু আর।

মহারাজ, ধন তুচ্ছ বস্তু নয়—

কুলাচার-বলে শুধু সেবা কভু পায় না নির্ধন,
নিজের পত্নীও ছাড়ে, ছাড়িবেনা কেন অন্যজন ?

এটাও দোষ ; রাজারও—

অতিব্যয়, ঔদাসীন্য, অধর্মে অর্জন,
কর্মচারী-কৃত চৌর্য, দূরে-সংরক্ষণ—
কোষের ব্যাপারে এরা বিপত্তিকারণ।

কারণ— আয়ের হিসাব নাই, যথেচ্ছ যে ব্যয় করে যায়,
হলেও কুবেরতুল্য, শেষে এসে পথে সে দাঁড়ায়।'

এ-সব শুনে স্তব্ধকর্ণ বলল, 'দেখুন দাদা, আপনার বহুকালের আশ্রিত এই দমনক-করটক হচ্ছে সন্ধি ও যুদ্ধ ব্যাপারের সচিব, অর্থব্যাপারে এদের নিয়োগ করা উচিত নয়। কোন্ কাজে কা'কে নিয়োগ করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু শোনা আছে ; বলি, শুনুন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জ্ঞাতি—যোগ্য নয় অর্থ-অধিকারে
থাকিলেও কোষে অর্থ, ব্রাহ্মণ তা কিছুতে না ছাড়ে।
ক্ষত্রিয় নিযুক্ত হলে, নিঃসন্দেহে কৃপাণ দেখায়।
জ্ঞাতি সে জ্ঞাতিত্ব-বলে সর্বস্বই গ্রাসিবারে চায়।
রাখিলে পুরানো ভৃত্যে, নিঃশঙ্ক সে থাকে অপরাধে ;
প্রভুকে অবজ্ঞা করি ইচ্ছামত চলে সে অবাধে।
উপকর্তা রাখা হলে, স্বীয় দোষে গণে না সে দোষ ;
উপকারী-অভিমানে শেষ করি দেয় রাজকোষ।
নর্মসখা মন্ত্রী হলে, রাজা-হেন ভাবে সে নিজেকে ;
নিত্য পরিচয় হেতু প্রভুরে সে ছোট করি দেখে।
অনর্থ ঘটায় মন্ত্রী হয় যদি কপট-আচার
শকুনি ও শকটার রয়েছেন দৃষ্টান্ত তাহার।

অমাত্য সমৃদ্ধ হলে, বশে সদা থাকে না রাজার ;
মুনিদের মতে, ঋদ্ধি নিয়ে আসে চিত্তের বিকার।

কু-মন্ত্রীর লক্ষণ সব—

যে অমাত্য রাজকর হরে, রাজদ্রব্য বিনিময় করে,
বিচারে যে পক্ষ কোন লয়, রাজকার্যে উদাসীন রয়,
অবিবেক ভোগাসক্ত হয় — সে অমাত্য দূষিত নিশ্চয়।
যার মতি ধনাগমে নাই ; যার মনে সন্দেহ সদাই ঃ
তার কাজে নৃপতি কি তুষ্ট, অথবা কি হয়েছেন রুষ্ট ?
নিজের দক্ষতা যেবা গায়, কার্যকালে যারে দেখা যায়
ঘটাইতে নানা বিপর্যয় সে অমাত্য দূষিত নিশ্চয়।

তাহলে রাজার উপায়—

সেবকেরা যেন দুষ্ট ব্রণ ঠিকমত করিলে পীড়ন
আত্মসাৎ-করা রাজধন গল্ গল্ করে উদ্গীরণ।
'ভৃত্যদের ধন বাড়ে কার' পুনঃ পুনঃ জ্ঞাতব্য রাজার।
স্নান-বস্ত্র সব জল ছাড়ে তারে যদি বারেক নিঙাড়ে ?

এই সব নীতিবাক্য বুঝে অবসর মত প্রয়োগ করা উচিত।'

পিঙ্গলক বললেন, 'কথা ঠিক। কিন্তু এরা দুজন তো সকল ব্যাপারে আমার কথা-মত চলে না।'

স্তব্ধকর্ণ বলল, 'এ তো মোটেই উচিত নয়। কারণ—

আজ্ঞা তার না মানিলে, রাজা পুত্রদেরও দেন তার সাজা।
তা নহিলে প্রভেদ কোথায় রাজ-চিত্রে আর সে-রাজায় ?
যে-জন নিশ্চেষ্ট তার কীর্তিনাশ হয় ;
খলের মিত্রতা-নাশে নাহিক সংশয় ;
বংশ লোপ হয় যার ইন্দ্রিয় বিকল ;
জুয়াড়ীর নষ্ট হয় সর্ব বিদ্যাফল ;
কৃপণের সৌখ্য যায়, ধরম লোভীর ;
সচিব প্রমত্ত হলে, রাজ্য নৃপতির।

বিশেষত—

তস্কর বা রাজ-কর্মচারী শত্রু কিংবা শ্যালক রাজারই,
কিম্বা লোভ রাজার নিজের পীড়া যদি দেয় প্রজাদের,
নরপতি, পিতার মতন, করিবেন তাহা নিবারণ।

আমরা যেমন বলছি, আপনি সেই মত চলুন তো। আমরাও এ-ভাবে চলে দেখেছি। এই সঞ্জীবক হল শস্যভোজী; একেই আপনার খাদ্য রাখার ভার দিন।'

স্তব্ধকর্ণের কথামত কাজ হল। সেই থেকে পিঙ্গলক আর সঞ্জীবকের মধ্যে অন্য সব বন্ধুদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতা বেশী হল; তা'রা দুজনে পরম স্নেহে কাল কাটাতে লাগল।

এদিকে, রাজা তাঁর অনুজীবিদের খাদ্য জোগানর ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন দেখে করটক আর দমনক পরস্পর পরামর্শ করল। দমনক করটককে বলল, 'এখন কি করা যায়, ভাই? ভুলটা আমাদেরই। নিজেরা দোষ করে তা নিয়ে বিলাপ করতে বসা উচিত নয়।' একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার সে বলল, 'বন্ধু, আমিই না ভেবেচিন্তে এঁদের মধ্যে সৌহার্দ ঘটিয়েছিলাম, এখন তেমনি বিচ্ছেদ ঘটাব। কারণ—

অসত্যে বানায় সত্য চতুর যে নর,
সমে নিম্নোন্নত-ভ্রম সৃজে চিত্রকর।'

করটক বলল, 'তা তো হল। কিন্তু এঁদের এই অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে কি করে বিচ্ছেদ আনা যাবে?'

দমনক বলল, 'উপায় একটা ভাবতে হয়। কথায় বলে—

বিক্রম যা পারে নাকো, কৌশল তা পারে,
স্বর্ণসূত্র দিয়ে কাক কৃষ্ণসর্পে মারে।'

করটক বললে, 'সে আবার কী?'

দমনক গল্প সুরু করল—

কাকদম্পতি ও কৃষ্ণসর্পের গল্প

এক গাছে এক কাক দম্পতি বাস করত। সেই গাছের কোটরে যে কৃষ্ণসর্প থাকত সেটা তাদের বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেলত। পুনরায় গর্ভবতী হয়ে কাকের বউ কাককে বলল, 'এ গাছটা ছাড়তে হবে। ঐ কৃষ্ণসর্পটি যতদিন এখানে থাকবে ততদিন আমার সন্তান-সন্ততি বাঁচবে না। কারণ—

দুষ্টা ভার্যা, শঠ মিত্র, সেবক উদ্ধত,
সর্প-সহ গৃহে বাস—মরণেরই মত।

কাক বলল, 'প্রিয়ে ভয় করবার কিছু নাই। আমি বার বার এটার মহা অপরাধ সহ্য করেছি, এবার আর ক্ষমা করব না।'

কাক-বৌ বলল, 'এই কৃষ্ণসর্প বলবান ; এর সঙ্গে আপনি লড়াই করতে পারবেন কি ভাবে ?'

কাক বলল, সে চিন্তা মিছে। কারণ—

বুদ্ধি যার, বল জেনো তার ; নির্বোধেরা কিবা বল ধরে ?
মদোন্মত্ত সিংহ দুরাচার শশকের হাতে মারা পড়ে।'

কাক-বৌ বলল, 'কেমন ?'

কাক গল্প সুরু করল—

সিংহ ও খরগোসের গল্প

মন্দর পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ থাকত। সে যখন তখন পশুদের ধরে ধরে বধ করত। একবার সমস্ত পশু একজোট হয়ে সিংহকে জানাল, 'মহারাজ, এ ভাবে সব পশুকেই মারবেন কেন ? যদি অনুগ্রহ করেন, আমরাই আপনার আহারের জন্য প্রত্যহ একটি করে পশু উপহার দেব।'

সিংহ বলল, 'এই যদি তোমাদের মত হয়, তাহলে তাই হোক।'

তখন থেকে প্রত্যহ একটি করে পশু তার কাছে উৎসর্গ করা হত ; আর সে তাই খেয়ে থাকত।

একবার এক বৃদ্ধ খরগোসের পালা এল। সে মনে মনে ভাবল —

মারকের কাছে গিয়ে বিনয় প্রকাশ
প্রাণের আশাতে করা হয়।
মারা তো যাবই, তবে সিংহের কাছে
মিছে কেন করি অনুনয় ?

সুতরাং ধীরে সুস্থে তার কাছে যাই।

সে যখন পৌঁছুল, সিংহ তখন ক্ষুধায় অস্থির। সিংহ তাকে ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'এত বিলম্বে এলি কেন রে ?'

খরগোস বলল, 'মহারাজ, দোষী আমি নই। আমি আসছিলাম, আর একটা সিংহ আমাকে জোর করে ধরলেন। তাঁর কাছে ফিরে আসার শপথ করে প্রভুকে তাই নিবেদন করতে এসেছি আমি।'

সিংহ সকোপে বলল, 'এখনই চল, আমাকে দেখাবি চল সেই দুরাত্মাটাকে।'

খরগোস তাকে নিয়ে একটা গভীর কূপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে এসে, 'আপনি নিজেই দেখুন মহারাজ' এই না বলে, সেই কূপের জলে সিংহের যে ছায়া পড়ল সেটাকে দেখিয়ে দিল। সিংহ দর্পভরে সেই ছায়া-সিংহের উপর লাফিয়ে পড়ে তক্ষুণই মারা গেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

বুদ্ধি যার বল তার, নির্বোধের বল সে নিষ্ফল।'

কাক-বৌ বলল, 'এ তো শুনলাম। এখন কি করতে হবে বলুন।'

কাক বলল, 'প্রিয়ে! নিকটেই যে সরোবর আছে, রাজপুত্র সেখানে এসে নিত্যই স্নান করেন। স্নান করার সময় স্বর্ণসূত্রটি তাঁর অঙ্গ থেকে খুলে ঘাটের সিঁড়ির উপর রাখা হলে, তুমি সেটি

চঞ্চুতে ধরে এই কোটরে এনে রেখে দিও।' তারপর একদিন রাজপুত্র যখন স্বর্ণসূত্রটি পাথরের সিঁড়ির উপর রেখে স্নান করতে জলে নামলেন, কাক-বৌ তাই করল। স্বর্ণসূত্র খুঁজতে এসে রাজপুরুষ সেই কোটরের মধ্যে কৃষ্ণসর্পকে পেয়ে তাকে মেরে ফেলল।

এই জন্যই বলছিলাম,—বিক্রম যা পারে নাকো, কৌশল তা পারে।

করটক বলল, 'তাই যদি হয় তো যাও, তোমার পথ নির্বিঘ্ন হোক্।' দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ একটা মস্ত ভয়ের কারণ মনে নিয়ে আপনার কাছে তা নিবেদন করতে এসেছি। যেহেতু—

আপদের কালে কিম্বা উন্মার্গ-যাত্রায়,
কার্যকাল-অতিপাতে আর,
হিতাকাঙ্ক্ষী বলিবেন বিনা জিজ্ঞাসায়
হিতবাক্য তাঁর।—

তা ছাড়া—

রাজারই রয়েছে রাজ্যভোগে অধিকার;
মন্ত্রীর উপরে ন্যস্ত যত কার্যভার।
রাজকার্যে কোনরূপ ঘটিলে ব্যাঘাত
মন্ত্রী ছাড়া আর কেবা দোষ ভাগী তার?

তাছাড়া দেখুন, অমাত্যদের পক্ষে নিয়ম হল এই—

প্রভু-হিতে মৃত্যু কিম্বা শিরশ্ছেদ হোক,
সেও ভালো তবু
প্রভুপদ-আকাঙ্ক্ষীর পাপ নাহি দেখা
ভালো নয় কভু।'

পিঙ্গলক আদর করে বললেন, 'এখন, তুমি বলতে চাইছ কি?'

দমনক বলল, 'মহারাজ, এই সঞ্জীবককে আপনার সম্পর্কে অনুচিত আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে! আমাদের সামনেই সে

আপনার ত্রিবিধ রাজশক্তির নিন্দা করছে, সে রাজা হওয়ার অভিলাষ করছে।'

এ-কথা শুনে পিঙ্গলক ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে চুপ করে থাকলেন। দমনক পুনরায় বলল, 'মহারাজ, আর সব অমাত্যকে ত্যাগ করে আপনি যে একেই সব কাজের ভার দিয়েছেন এটি বড়ই ভুল হয়েছে। কারণ—

রাজা সহ, মন্ত্রী তাঁর অতিবলী হলে—
দু'নায়ে চরণ রাখি লক্ষ্মী র'ন খাড়া,
স্ত্রী-স্বভাবে তাঁর তাহা অসহ ঠেকিলে
তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক একটিকে ছাড়া।

তা ছাড়া—

মন্ত্রীরে নৃপতি যদি করি দেন অনন্যপ্রধান,
সহজে অন্তরে তার হয় মোহ-মদের সঞ্চার।
রাজা হতে ক্রমেই সে দূরে দূরে করে অবস্থান,
অবশেষে মনে মনে স্বাতন্ত্র্য-লালসা জাগে তার ;
তারই বশে মন্ত্রী শেষে নিতে চায় নৃপতির প্রাণ।

শাস্ত্রে আছে—

বিষ-দেওয়া ভাত, নড়ে-যাওয়া দাঁত,
মন্ত্রী দোষাধার—
বিবর্জন ছাড়া সুখ নাহি আর।

এ-কথাও বলা হয়েছে—

সচিবের হাতে লক্ষ্মী থাকে যে-রাজার,
সে সচিব কোন ক্রমে পাইলে বিকার
যষ্টিহীন অন্ধ-সম দশা হয় তাঁর।

এরকম অমাত্য সব কাজেই স্বেচ্ছামত চলে। এখন আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।'

সিংহ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তাও যদি হয়, সঞ্জীবকের সঙ্গে আমার যে খুব ভালোবাসা। দেখো—

অনিষ্ট করুক যতো, প্রিয় যে প্রিয়ই থাকে ;
যত দোষ থাক, দেহে কে না আদরে রাখে ?
অপ্রিয় করুক কর্ম, প্রিয় যে প্রিয়ই থাকে ;
অনল যা দহে গৃহ আদর করে না তাকে ?'

দমনক বলল, 'মহারাজ। এটি তো বড় দোষ। কারণ—

পুত্র, অমাত্য কিংবা অন্য কারো 'পরে
নৃপতির স্নেহদৃষ্টি বেশী যদি পড়ে
লক্ষ্মীদেবী নিশ্চিতই যান তারি ঘরে।

মহারাজ, শুনুন—

অপ্রিয় যে হিতবাক্য, শুভ হয় তারও শেষ ফল।
তার বক্তা শ্রোতা যেথা, সেথা রয় সম্পদ সকল।

আপনি পুরাণো ভৃত্যদের ত্যাগ করে এই নবাগতকে সম্মান দিলেন। এ কাজটা ঠিক হয় নাই। কারণ—

পুরাণোর দোষে, রাখা ভৃত্য নবাগতে
উচিত তো নয় কোনোমতে ;
রাজ্যের ভেদ তাতে ফাঁস হয়, তাই
তার থেকে বড় ভুল আর কিছু নাই।'

সিংহ বললেন, 'বড়ই আশ্চর্য ! একে আমি অভয় দিয়ে আনলাম, তাকে বড় করলাম ! সে কেন আমার বিরুদ্ধ হল ?'

দমনক বলল, 'মহারাজ !

নিত্য সেবা পাইলেও খল থাকে খল,
কদাচ স্বভাব তার হয় না সরল ;
যত তাতে তাপ দাও, তেল মলো, তবু
কুকুরের লেজ সোজা হয় নাকো কভু।

সত্যই— তাপ দাও, মর্দন করো, কিম্বা তাতে দড়িই জড়াও,
দশ-বারো বৎসর পরও যেমনি দড়িটি খুলে নাও,
কুকুরের পুচ্ছটি ফের পাইবেই স্বভাব নিজের।

এ-কথাও ঠিক যে—

যতো কেন খাওয়াও পরাও যতো তাকে সম্মানই দাও,
তুষ্ট কভু হবে নাকো খল।
সেচিলেই অমৃতের জল বিষতরু দেয় কি সুফল ?

দেখুন— যার যা স্বভাব, সে তা কাটাতে না পারে।
কুকুরে করিলে রাজা, জুতো চাটা ছাড়ে ?

এই জন্যই বলছি—

যেচে তারে হিত বলা ভালো
চাই নাকো যার পরাজয়,
সাধুদের ধর্ম তো এই।
তা না হলে অধর্মই হয়।

লোকে ঠিকই বলে—

অমঙ্গল নিবারে যে সেই তো বৎসল।
সে-কর্মই কর্ম শুধু যে-কর্ম নির্মল।
চলে যে পতির ছন্দে ভার্যা তিনি হন।
বুদ্ধিমান বলি তারে পূজে যে সজ্জন।
মদ-সৃষ্টি করে না যা শ্রী বটে তাহাই।
সুখী সেই, চিত্তে যার তৃষ্ণা কিছু নাই।
মিত্র অকপট হলে মিত্র তাকে কয়।
পুরুষ সে, বশে যার ইন্দ্রিয়-নিচয়।

সঞ্জীবক যে বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে তা জানানো সত্ত্বেও যদি মহারাজ নিবৃত্ত না হন, সেটা এ ভৃত্যের দোষ নয়। কথাই আছে—

কামাসক্ত হলে রাজা, কর্তব্য বা হিত কথা
উপেক্ষার বস্তু হয় তাঁর ;
মদমত্ত গজ-সম স্বচ্ছন্দে তখন তিনি
করে যান যথেচ্ছ আচার।
অহঙ্কারে অভিভূত পশ্চাৎ পড়েন যবে
বিপদের দুস্তর সাগরে,

নিজ-দোষ ভুলি তিনি সব দোষ তুলে দেন
হতভাগ্য ভৃত্যের উপরে।'

পিঙ্গলক মনে মনে ভাবলেন—

'অপবাদ শুনি পরমুখে, অনুচিত অন্যে শাস্তিদান।
নিজে সব করিয়া সন্ধান দাও মৃত্যু অথবা সম্মান।

শাস্ত্রে বলে—

না করিয়া দোষ-গুণ-বৈধনির্ধারণ
অনুচিত অনুগ্রহ অথবা শাসন ;
হয় তাহা সুনিশ্চিত বিনাশ কারণ ;
দর্পভরে সর্প-মুখে হস্তপ্রসারণ।

প্রকাশ করে বললেন, 'তা হলে সঞ্জীবককে কি ত্যাগ করতে হবে ?'

দমনক সসম্ভ্রমে বলল, 'না মহারাজ, মোটেই না। তা হলে তো ভিতরের কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। শাস্ত্রে রয়েছে—

উচিত মন্ত্রের বীজ রাখা সংগোপনে
স্বল্পমাত্র যেন নাহি জানে কোনো জনে।
প্রকাশ পেলেও যেন সেই বীজ হতে
অঙ্কুর-উদ্‌গম নাহি হয় কোনো মতে।

এ-কথাও বলা হয়েছে—

যা নেবার, যা দেবার আছে, আছে যা করার,
শীঘ্র না সারিলে, কাল হরে রস তার।—

সুতরাং কাজে হাত দিয়ে তা অতি যত্নে সম্পাদন করা উচিত। কেন না—

সর্ব-অঙ্গে সুরক্ষিত যদিও তা রয়,
মন্ত্র সে যোদ্ধার মত ধৈর্যহারা হয় ;
শত্রু হতে করে শুধু বিদারণ-ভয় ;
সুচির বিলম্ব তার তাই নাহি সয়।

যদি তার দোষ প্রত্যক্ষ করার পরও, তাকে দোষ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে তার সঙ্গে সন্ধি করেন, তবে তা খুবই অনুচিত হবে। কারণ—

একবারও দোষী দেখে মিত্র সাথে সন্ধি পুনঃ করে যেই জন,
মৃত্যুকে সে ডেকে লয় ; গর্ভ ধরি মৃত্যু ডাকে খচ্চরী যেমন।

সিংহ বললেন, 'ও আমাদের কী করতে পারে সেটা তো জানা দরকার।'

দমনক বলল, 'মহারাজ—

বলাবল না জানিয়া হয় কারো সামর্থ্য নির্ণয় ?
ক্ষুদ্র টিট্টিভের বলে সমুদ্রও বিক্ষোভিত হয়।'

সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?'

দমনক বলতে সুরু করল—

সমুদ্র ও টিট্টিভ দম্পতির গল্প

দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে এক টিট্টিভ পক্ষী তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করত। টিট্টিভীর সন্তান হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে সে তার স্বামীকে বলল, 'নাথ, প্রসবের উপযুক্ত একটা নিভৃত স্থান সন্ধান করুন।'

টিট্টিভ বলল, 'প্রিয়ে এইটিই তো প্রসবের বেশ যোগ্য স্থান !'

টিট্টিভী বলল, 'এ-স্থান যে সমুদ্র-প্রবাহে ভেসে যায় !'

টিট্টিভ বলল, 'ভদ্রে, আমি কি এতই দুর্বল যে, আমার গৃহস্থিত অণ্ডগুলিকেও সমুদ্র অপহরণ করবে, আমাকে এ-ভাবে নিগ্রহ করা হবে ?'

টিট্টিভী হেসে বলল, 'নাথ, আপনার আর সমুদ্রের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি ! তবে—

অযোগ্য কি যোগ্য নিজে বুঝে ওঠা সহজ তো নয় ;
সে-জ্ঞান রয়েছে যার বিপদেও নাই তার ভয়।

কিন্তু— অনুচিত কর্মে দেওয়া হাত ; বৈরভাব স্বজনের সাথ,
বলীয়ান্ সহ স্পর্ধা, আর প্রমদায় বিশ্বাস—এ চার
অনিবার্য মৃত্যুর দুয়ার।'

স্বামীর কথামত টিট্টিভী সেখানেই প্রসব করল। টিট্টিভ-টিট্টিভীর এ-সব কথাই সমুদ্র শুনেছিল ; শক্তিপরীক্ষার জন্য সে ডিমগুলি চুরি করল।

শোকাতুরা হয়ে টিট্টিভী তার স্বামীকে গিয়ে বলল, 'ওগো সর্বনাশ হয়েছে ; আমার ডিমগুলি নষ্ট হয়েছে।'

টিট্টিভ বলল, 'প্রিয়ে, ভয় নাই।' এই বলে সে সমস্ত পাখীদের একত্র করে পক্ষীরাজ গরুড়ের কাছে চলল। সেখানে গিয়ে সে তার ডিমগুলি নষ্ট হওয়ার কথা নিবেদন করল, 'মহারাজ, নিজের বাড়ীতে থেকেই আমি বিনা অপরাধে সমুদ্রের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছি।' তার কথা শুনে গরুড় সমস্ত ঘটনা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ ভগবান নারায়ণকে জানালেন। ভগবান সমুদ্রকে ডিমগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। ভগবানের আজ্ঞা মাথায় তুলে নিয়ে সমুদ্র সেই ডিমগুলি টিট্টিভকে প্রত্যার্পণ করল।

এই জন্যই বলছিলাম—

বলাবল না জানিয়া হয় কারো সামর্থ্য নির্ণয় ?
ক্ষুদ্র টিট্টিভের বলে সমুদ্রও বিক্ষোভিত হয়।'

রাজা পিঙ্গলক বললেন, 'ও যে অনিষ্ট করতে চায়, কি করে তা বুঝব ?'

দমনক উত্তর দিল, 'সে যখন সন্ত্রস্তের মত শৃঙ্গাগ্র দিয়ে গুঁতোতে উদ্যত হয়ে আপনার দিকে আসবে, তখন বুঝবেন।' এই বলে সে সঞ্জীবকের কাছে চলল। সেখানে এসে সে বিষণ্ণের মত ভাব করে ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সঞ্জীবক তাকে আদর করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্র দমনক, সব কুশল তো ?'

দমনক বলল, 'ভৃত্য যারা তাদের আবার কুশল কোথায় ? কারণ—

রাজার আশ্রিত যারা পরাধীন তাহাদের ধন,
চিত্তও অসুস্থ সদা অনিশ্চিত তাদের জীবন।

তা ছাড়া—

অর্থ লভি কার মনে জন্মেনাকো মদ?
বিষয়ী কাহারো অস্ত যায় কি বিপদ?
নারীদের অখণ্ডিত থাকে কার মন?
চিরকাল রাজপ্রিয় কে থাকে কখন?
যম কারে বাঁধেনাকো বাহুর বন্ধনে?
যাচক হইয়া মান পায় কোন জনে?
দুর্জনের পাতা ফাঁদে পা ফেলিয়া, হায়,
এ জগতে কে কোথায় নিষ্কৃতি বা পায়?'

সঞ্জীবক বলল, 'কী হয়েছে ভাই, বল তো!'

দমনক বলল, 'আমার কপাল মন্দ, কী আর বলব? দেখ—

সাগরের জলে পড়ি সর্প যার হয়েছে আশ্রয়,
ছাড়ে না সে সর্পে সেই, আঁকড়িতে পায় মহা ভয়।
সম্প্রতি তাহার মত হতবুদ্ধি হয়েছি নিশ্চয়।

তার কারণ—

একদিকে রাজার বিশ্বাস, বন্ধু অন্য দিকে—
দুই কূল রক্ষা করা যায় যে কি করে?
কী যে করি, পড়ে গেছি দুঃখের সাগরে।'

এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

সঞ্জীবক বলল, 'তা হোক, তোমার মনের কথা সবই খুলে বল।'

দমনক চুপিচুপি বলল, 'যদিও রাজা যা বিশ্বাস করে বলেছেন অন্য কাউকে তা বলা ঠিক নয়, তবে কিনা তুমি আমাদের কথার উপর নির্ভর করেই এখানে এসেছ, এখানে রয়েছ; সেই কারণে আমার পরলোকের ভাবনাও তো ভাবতে হবে! তোমার যাতে হিত হয় সেটা তোমাকে অবশ্যই আমার জানানো দরকার। শোনো, আমাদের এই প্রভুর মন তোমার উপর বিগড়ে গিয়েছে। আমাকে

নির্জনে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, 'সঞ্জীবককে হত্যা করে আপন পরিবারকে আমি খুশী করব।"

এ কথা শুনে সঞ্জীবক খুব মুষড়ে পড়ল। দমনক তাকে বলল, 'দুঃখ করে কী হবে? সময়ের অনুরূপ কাজ কর।'

সঞ্জীবক কী যেন একটুখানি ভেবে বলল, 'কথাটা ঠিকই বলা হয় যে—

নারী যায় দুর্জনের কাছে,
রাজা পোষে যত অযোগ্যরে,
ধন যায় কৃপণের পাছে ;
ইন্দ্র বর্ষে পাহাড় সাগরে।

এ কথাটাও—

নীচজনে লক্ষ্মী আর বাণী অকুলীনে, করেন আশ্রয় ;
অপাত্রেই ভজে নারী, ইন্দ্রের বর্ষণও পাহাড়েই হয়।—'

নিজের মনে-মনে সে ভাবল, এ-ই এ-কর্ম করেছে কি না বুঝতে পারছিনা! যেহেতু—

দুর্জনে আশ্রয়-গুণে সাধু মনে হয়।
কাজলে কামিনী-চোখ যথা কান্তিময়।

এই ভেবে সে বলল, 'হায় রে! এ কী হল?

পেয়েও সযত্ন সেবা নৃপতির না হয় সন্তোষ।
এ কিন্তু অপূর্ব দেখি, সেবা পেয়ে জন্মে এঁর রোষ!

সুতরাং এ-চেষ্টা মিথ্যা। যেহেতু—

কারণ থাকায় যদি ক্রোধ কারো হয়,
সে-কারণ দূর হলে ক্রোধ নাহি রয়।
অকারণে দ্বেষ যদি জন্মে কারো মনে,
কী করি সন্তুষ্ট করা যাবে সেই জনে।

রাজার কি আমি কোনো অপকার করেছি? না, রাজারা বিনা কারণেই অপকারী হন।'

দমনক বলল, 'তাই হন। শোনো—

উপকার লভিয়াও দ্বেষ করে কেহ
না গণিয়া বিজ্ঞতা কি স্নেহ।
কেহ দেখি প্রীতি দেয় অপকার পেয়ে।
বিচিত্র কী আছে এর চেয়ে ?
প্রভুদের কে বোঝে চরিত্‌ ? একভাবে থাকে কদাচিৎ।
সেবাধর্ম বড়ই দুষ্কর, যোগীদেরও তাহা অগোচর।

এ কথা যথার্থ যে—

দুর্জনের করো তুমি শত উপকার
কখনও সুফল কিছু পাবে নাকো তার।
মূর্খজনে দাও তুমি শত উপদেশ,
অবাধ্যকে শতবার দাও না আদেশ,
অচেতনে করি দেখো শত বুদ্ধিদান—
পাবে না, পাবে না, কোনো ফলের সন্ধান।

এটাও মিথ্যা নয়—

সাপ থাকে চন্দনের গাছে ; পদ্মসরে হাঙ্গরও আছে।
গুণীদের গুণাবলী খেতে খল যেন থাকে ওঁৎ পেতে।
কোনও বিষয়-ভোগে হায় বিঘ্নহীন সুখটি কোথায় ?

দেখ না কেন ?—

চন্দন গাছের মূলে বিষসাপ রয়,
তার ফুলগুলি হল ভ্রমর-আশ্রয় ;
বানরেরা থাকে তার শাখার উপরে ;
ভল্লুকরা ওঠে গিয়া তাহার শিখরে ;
হেন কোনো অঙ্গ তার খুঁজিবে বৃথায়
ক্রূর দুষ্ট জীব-ভয় নাহিকো যেথায়।

আমি তো জানি আমাদের রাজা বাক্যে মধুর, কিন্তু হৃদয়ে তাঁর গরল—

দূরে দেখেই তোলেন তিনি হাত,
করেন কতো আনন্দাশ্রু-পাত ;

টেনে নিয়ে আপন অর্ধাসনে
গাঢ় নিবিড় আলিঙ্গনের সাথ
আদর করেন কুশল সম্ভাষণে
বাইরে মধু অন্তরে বিষ তাঁর
কপটতায় দোসর পাওয়া ভার।
খলদের এই নাটক অভিনয়
দেখে বড়ই লাগে যে বিস্ময়।

সত্যই— সাগর তরিতে আছে অর্ণবযান,
অন্ধকার ঘনাইলে আছে দীপখান,
বাতাস না থাকে যদি রয়েছে ব্যজন,
অঙ্কুশ রয়েছে গজে করিতে দমন,
সকল ঠেকার আছে যা-হোক উপায়।
খলতা ঠেকাতে হার মানে বিধাতায়।'

সঞ্জীবক আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে উঠল কী বিপদ! আমি শস্যভক্ষক জীব, সিংহ কেন আমাকে মারতে চায়?—

যে-জন সমান-বিত্ত সম-বল হয়,
দ্বন্দ্ব বাধে তার সাথে;
উত্তম বা অধমের সাথে কভু নয়।'

আবার একটু চিন্তা করে সে বলল, 'এ রাজা আমার উপর কেন বিগড়ালেন জানি না। রাজা চটলে তাঁকে সব সময়েই ভয় করা উচিত। কারণ—

মন্ত্রী ও রাজায় যদি ভাব ভেঙ্গে যায় জোড়ে নাকো আর।
স্ফটিকের চুড়ি যদি ভাঙ্গে একবার, জোড়ে সাধ্য কার?
বজ্র আর রাজরোষ বড় ভয়ঙ্কর,
বজ্র পড়ে একস্থানে, রাজরোষ অনেকেরই 'পর।

সুতরাং সংগ্রামে মৃত্যুই ভাল। ইদানীং তাঁর আজ্ঞা পালন করা ঠিক হবে না। কারণ—

মরি' স্বর্গলোক-লাভ, সুখভোগ বধিয়া শত্রুরে—
দুই গুণই সুদুর্লভ ; দেখা যায় একমাত্র শূরে।

এটি যুদ্ধেরই সময়—

যে-সময় না যুঝিলে মরণ নিশ্চয়,
যুঝিলে হইতে পারে জীবন সংশয়,
বুধেরা বলেন তাহা যুদ্ধের সময়।

সত্যই— অযুদ্ধেতে হিত কোন না দেখিলে পরে
শত্রু সাথে যুঝি প্রাজ্ঞ মরণেও বরে ;
জয়ে লক্ষ্মী, মরণে সে সুরাঙ্গনা লভে।
এ দেহ অমর নয়, চিন্তা কিবা তবে ?

এই ভেবে সঞ্জীবক বলল, 'উনি যে আমাকে মারতে চান তা কি করে জানা যাবে ভাই ?'

দমনক বলল, 'উনি যখন কান খাড়া করে, লেজ উঁচিয়ে, পা তুলে, মুখ বিকৃত করে তোমার দিকে চাইবেন, তখন তুমিও নিজের বিক্রম দেখাবে। কারণ—

বলবান জনও যদি তেজোহীন হয়,
সকলের কাছে তার ঘটে পরাজয়।
ভস্মে দলিয়া যেতে লাগে কার ভয় ?

কিন্তু এ সবই গোপন রাখতে হবে, নইলে তুমিও নাই, আমিও নাই।'—এই বলে দমনক করটকের কাছে চলে গেল।

করটক জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

দমনক বলল, 'ওদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হল।'

করটক বলল, 'তাতে আর সন্দেহ কি ? কারণ—

দুর্বৃত্ত লোকের বন্ধু কোনজন বটে ?
অতিযাচকের 'পরে কে না বলো চটে ?
বিত্ত হলে কার বলো গর্ব নাহি হয় ?
কু-কর্ম করার বেলা দক্ষ কেবা নয় ?

তা ছাড়া—

শঠেরা আপন স্বার্থে লক্ষ্মীমানে দুর্বৃত্ত বানায়।
অগ্নিবৎ খল-সঙ্গ, সব কিছু খাক্ করে যায়।'

তারপর দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ পাপাশয়টা এসে গিয়েছে ; আপনি তৈরী হয়ে থাকুন।' সে তাঁকে কান-খাড়া, লেজ-উঁচু, পা-ওঠানো আর মুখ হাঁ-করা অবস্থায় থাকতে বলল।

সঞ্জীবক কাছে এসে সিংহকে ঐ রকম বিকৃত-আকার দেখে আপনার ঢঙে তার বিক্রম প্রকাশ করল। ফলে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল ; যুদ্ধে সিংহের হাতে সঞ্জীবক মারা পড়ল।

সেবক সঞ্জীবককে হত্যা করে পিঙ্গলক শ্রান্ত হয়ে সিংহাসনে বসে দুঃখ করতে লাগলেন, 'কী নিষ্ঠুর কাজই করলাম!—

সিংহ যথা বধে গজ, খায় তার অনুজীবিগণ
পরে রাজ্য ভোগ করে, রাজা হন পাপের ভাজন।
তাঁরই হয় ধরম-লঙ্ঘন।

তা ছাড়া—

গুণী ও ধীমান ভৃত্য, অংশ বা রাজ্যের
হারালে রাজার ক্ষতি দারুণ নিশ্চয়।
কৌশলে বা বীর্যবলে ভূমি মেলে ঢের,
অনুগত ভৃত্য-নাশ মৃত্যুতুল্য হয়।'

দমনক বলল, 'এ আবার কী নূতন নিয়ম দেখছি, শত্রু নিধন করে সন্তাপ করছেন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

নরপতি চান যদি আপনার হিত,
জিঘাংসুরে বধ-করা তাঁহার উচিত,
হোক পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, হোক না সুহৃৎ।

পুনশ্চ— ধর্ম-অর্থ-কাম-তত্ত্ব জানেন যে-জন
অত্যন্ত দয়ালু তিনি কদাচ না হন।
ক্ষমাবান্ যেবা তার হস্তগত ধন
অপরে করিতে থাকে অবাধে হরণ।

কেন না— শত্রু-মিত্র সবে ক্ষমা, যতিদের বটে অলংকার ;
অপরাধী জীবে ক্ষমা নিন্দাহেতু হয় তা রাজার।

পুনঃ— রাজ্যলোভে, অহংকারে রাজ-পদে যেবা লোভ করে—
প্রাণোৎসর্গ ছাড়া কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে তার তরে ?

শাস্ত্রে য স্পষ্টই বলেছে—

নৃপতি দয়ালু আর বিপ্র সর্বভুক্,
ভার্যা স্বৈরিণী আর দুশ্চরিত্র সাথী
ভৃত্য প্রতিকূল আর সচিব প্রমাদী
অকৃতজ্ঞ—ইহাদের বর্জনেই সুখ।

বিশেষতঃ— রাজনীতি গণিকার মত।
সত্যাসত্য, কটু, প্রিয়,—সবই বলে প্রয়োজন মত।
জিঘাংসা রূপিনী কভু, কভু উহা করুণা মূরতি,
কভু উহা অর্থপরা, কখনো বা দানশীলা অতি ;
নিত্য ব্যয় করে আর নিত্য থাকে রত্নাগমে রত।
রাজনীতি গণিকার মত।

দমনকের এই কপট বাক্যে তুষ্ট হয়ে পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ হলেন। দমনক প্রফুল্ল হয়ে, 'মহারাজের জয় হোক! সর্ব জগতের কল্যাণ হোক', এই বলে মনের আনন্দে বাস করতে লাগল।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'সুহৃৎ-ভেদের বিষয় তো তোমরা শুনলে।'

রাজপুত্রেরা বললেন, 'আপনার অনুগ্রহে শুনলাম ; শুনে বড় সুখী হলাম।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'তা হলে এই বলে শেষ করি—

তোমাদের শত্রুগৃহে মিত্রভেদ হোক,
কালের কবলে যাক যত দুষ্ট লোক।
প্রজাগণ হোক সদা সর্বসুখভাগী,
গল্পে মোর বালকেরা হোক অনুরাগী।'
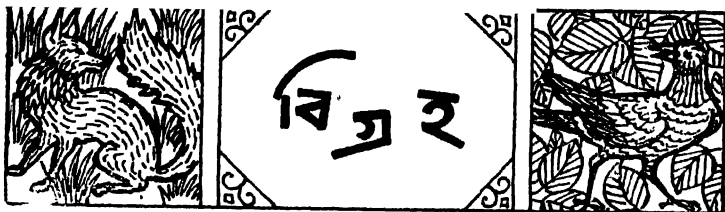
পুনরায় কথা আরম্ভ হওয়ার সময় রাজপুত্রেরা বললেন, 'আর্য, আমরা রাজপুত্র, তাই যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা শোনার জন্য আমাদের কৌতূহল হচ্ছে।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'তোমাদের যেমন রুচি সেইরকমই বলব। যুদ্ধের প্রসঙ্গই শোনো—এ প্রসঙ্গের প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

হংস ময়ূরের যুদ্ধে দুপক্ষই বিক্রমে সমান ;
কাককে আশ্রয় দিয়ে হংস-পক্ষ হল হতমান।'

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কীরকম ?'

বিষ্ণুশর্মা কাহিনী শুরু করলেন—

হংস ও ময়ূরদের গল্প

কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে এক সরোবর আছে। সেখানে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস বাস করতেন। সমস্ত জলচর পক্ষীরা একত্র হয়ে তাঁকে পক্ষীরাজ্যে অভিষিক্ত করল। কারণ—

সম্যক চালনা তরে রাজা না থাকিলে পরে
প্রজা ভুগে মরে।
মাঝি না থাকিলে তরী ডোবে না সাগরে ?

এ কথাও মিথ্যা নয় যে—

রাজার কর্তব্য হল প্রজা-সংরক্ষণ।
রাজার বর্ধন করে প্রজাগণ মিলে।
বর্ধন হইতে শ্রেয় কিন্তু সংরক্ষণ ;
শুভও অশুভ হয় রক্ষণ নহিলে।

একদিন ঐ রাজহংস স্বজন-পরিবৃত হয়ে বিস্তীর্ণ কমল-পর্যঙ্কে বসে আছেন, এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোন এক দেশ থেকে এসে তাঁকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করল। রাজা বললেন, 'দীর্ঘমুখ, দেশান্তর থেকে এলে, খবর কি বল।'

সে বলল, 'মহারাজ, গুরুতর খবর আছে। তাই বলতেই তো সত্বর চলে এলাম। শুনুন—

জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে এক পর্বত আছে। সেখানে চিত্রবর্ণ নামে নামে এক ময়ুর পক্ষীগণের রাজা হয়ে বাস করছেন। তাঁর অনুগত পক্ষী-চরেরা দগ্ধ-অরণ্যের মধ্যে আমাকে চরতে দেখে প্রশ্ন করে, 'কে তুমি? কোথা হতে আসছ?' আমি উত্তর দিই, 'আমি কর্পূরদ্বীপের সম্রাট রাজহংস হিরণ্যগর্ভের অনুচর। কৌতুক হওয়ায় দেশান্তর দেখতে এসেছি।' তা শুনে তা'রা জানতে চাইল, 'এই দেশের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠতর, কোনটির রাজা বেশী বড়?' আমি বললাম, 'আঃ, কী যে বলছ? কর্পূরদেশ হল স্বর্গের মত, সেখানকার রাজা হলেন দ্বিতীয় ইন্দ্র বিশেষ। সে আমি বর্ণনা করব কি করে? এই মরুভূমিতে পড়ে পড়ে তোমরা করছ কি? এস, আমাদের দেশে চলো।' আমার কথা শুনে সেই পক্ষীগুলি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কথাই আছে—

দুধ পানে সাপেদের বিষই যায় বেড়ে,
হিত বলো মূর্খকে, আসিবে সে তেড়ে।

পণ্ডিতেরা বলেন—

হিতকথা বিদ্বানকে ; অবিদ্বানে কদাচ না বোলো,
কপিকুলে হিত বলি পাখীগুলি নীড়ভ্রষ্ট হল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

পক্ষী ও বানরদের গল্প

নর্মদা নদীর তীরে পর্বতের উপত্যকা দেশে এক বিরাট শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সেই শিমুল গাছে নীড় বেঁধে একদল পাখী বেশ সুখেই বাস করত। বর্ষাকালে একদিন পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমে আকাশ আবৃত করে ফেলল; মুষলধারে বৃষ্টি হল। বানররা সেই বৃক্ষের তলদেশে এসে শীতে কাঁপছে দেখে পাখীরা দয়াপরবশ হয়ে বলল, 'ওহে বানররা সব শোনো—

খড়কুটা জড়ো করি চঞ্চুমাত্র দিয়া
নীড় বাঁধি মোরা দেখ আশ্রয় লাগিয়া।
হস্তপদ থাকিতেও তোমাদের কেন
দুর্ভোগ হেন?'

তা শুনে বানরদের মনে ক্রোধ জন্মাল, তারা বলাবলি করতে লাগল, 'পাখীগুলির ঐ সব বাসায় বায়ুর প্রবেশ নাই ওগুলির মধ্যে বেশ আরামে বসে ওরা আমাদের নিন্দা করছে! আচ্ছা, বৃষ্টির উপশম হোক না, দেখা যাবে তখন।' বৃষ্টি শান্ত হলে ঐ বানররা শিমুল গাছটাতে উঠে পাখীদের নীড়গুলি ভেঙে দিল; পাখীদের সমস্ত ডিম নীচে পড়ে গেল।

'এই জন্যই বলছিলাম—হিতকথা বিদ্বানকে; অবিদ্বানে কদাচ না বোলো।' দীর্ঘমুখ গল্প শেষ করল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাখীগুলি তখন কি বলল?'

দীর্ঘমুখ বলতে লাগল, 'ঐ রাজহংসটাকে আবার রাজা করল কে?' আমারও ক্রোধ হল, জবাব দিলাম, 'তোমাদের ঐ ময়ূরটাকে কে রাজা করল?' তা শুনে পাখীগুলি আমাকে বধ করতে উদ্যত

হল। তখন আমিও আমার বিক্রম দেখালাম। কারণ—

ক্ষমা পুরুষের শোভা ; তবে সর্বত্র তা নয়।

ক্ষমা দুর্বলতা শুধু প্রত্যাসন্ন হলে পরাজয়।'

রাজা একটু হেসে বললেন—

'নিজের ও পরের বল নির্ধারণ করি,

অন্তর যে বোঝে নাকো, মারে তারে অরি।

জান তো—

ব্যাঘ্রচর্ম-পরিচ্ছদ পরে গর্দভ সে বহুদিন ধরে

শস্যক্ষেতে আসছিল চরে।

বাক্য তার ছিল না সংযত ; অন্তে তাই হল সে নিহত।'

বক জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম !'

রাজা গল্প সুরু করলেন—

রজক ও ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভের গল্প

হস্তিনাপুরে বিলাস নামে এক রজক থাকত। তার গর্দভটা অতিরিক্ত ভার বহন করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই কারণে ঐ রজক তাকে ব্যাঘ্রচর্মে বেশ করে ঢেকে বনের কাছাকাছি শস্যের ক্ষেতে ছেড়ে রেখে এল। ফলে ক্ষেত্রপতিরা গাধাটাকে দূর থেকে দেখেই বাঘ মনে করে পলায়ন করত। একদিন এক শস্যরক্ষক ধূসরবর্ণের কম্বল মুড়ি দিয়ে ধনুর্বাণ সাজিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে মাঠের একান্তে বসে রইল। গাধাটা দূর থেকে তাকে দেখে, তাকে খুশী মত শস্য ভোজনে সবল ও সুপুষ্ট একটি গাধা মনে করে চীৎকার করতে করতে তার দিকে দৌড়ে গেল। ক্ষেত্ররক্ষক তার শব্দ শুনে বুঝল সেটা গাধা ; অনায়াসেই সে গাধাটাকে মেরে ফেলল।

এই জন্যই তো বলছিলাম—

ব্যাঘ্রচর্ম পরিচ্ছদ পরে গর্দভ সে বহুদিন ধরে

শস্যক্ষেতে আসছিল চরে।

বাক্য তার ছিল না সংযত তাই শেষে হল সে নিহত।'

দীর্ঘমুখ বলে চলল, 'তারপর সেই পাখীগুলি বলল, 'তবে রে শয়তান বক, আমাদের ভূমিতে চরছিস আর আমাদেরই রাজার নিন্দা করছিস ; তোকে এখন আর ক্ষমা করা চলে না। এই না বলে তা'রা সকলেই আমাকে ঠোকরাতে লাগল ; ক্রুদ্ধ ভাবে বলল, 'দেখ রে মূর্খ, তোর রাজা ঐ হংসটা তো সর্ব প্রকারেই নিস্তেজ ; রাজত্ব করার কোন অধিকার তার নাই, কারণ, অতিরিক্ত শান্তিপ্রিয় হওয়াতে যে-ধন মুঠার মধ্যে এল তাও যে রক্ষা করতে পারে না, সে আবার পৃথিবী শাসন করতে যায় কেন? তার রাজত্বই বা কিসের! তুই হলি একটা কূয়োর ব্যাঙ, তাই তার আশ্রয় নিতে বলছিস। শোন—

ছায়া দেয়, ফল দেয়, হেন বৃক্ষ করিবে আশ্রয়।
ফল যদি নাও ধরে, ছায়া তার থাকিবে নিশ্চয়।

পণ্ডিতরা বলেন—

না করিও হীনজনে সেবা, মহতেরে করিও আশ্রয়,
শুঁড়িনীর হাতে দুধ ; লোকে তবু বারুণীই কয়।

দেখ্— সংসর্গ-প্রভাবেতে, এ বড় বিস্ময়!
নির্গুণেও মহাগুণী বলে মনে হয়,
মহতেও ক্ষুদ্র বলে হতে পারে মনে ;
হাতীকেও ক্ষুদ্র লাগে দেখিলে দর্পণে।

জানিস্ তো?—

সিংহের আশ্রিত ছাগী, বনেও সে কারে না ডরায়।
রামের শরণ লভি, বিভীষণ লঙ্কারাজ্য পায়।

বিশেষ ক'রে—

রাজা হলে বলশালী, নামে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।
শশীর নামের গুণে, শশকেরা নিরাপদ রয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কেমন?'

পাখীরা বলল—

হাতী আর শশকদের গল্প

একবার বর্ষাতেও বৃষ্টি না হওয়ায় হাতীর একটা দল তাদের দলপতির কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আমাদের বাঁচার এখন উপায় কি? এখানে ছোট ছোট জন্তুদের ডুব দেওয়ার মতও একটা জলাশয় নাই; আমরা তো ডুব দিতে না পেয়ে মৃতবৎ হয়ে পড়েছি। কোথায় যাই? কী যে করি?' হস্তীরাজ অল্প দূর গিয়ে তাদের একটা নির্মল জলাশয় দেখালেন। সেই জলাশয়ের তীরে একদল শশক থাকত; যত দিন যেতে লাগল, ততই তা'রা হাতীদের পায়ের তলে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল। তা দেখে শিলীমুখ বলে এক শশক চিন্তিত হয়ে বলল, 'এই হাতীগুলি তৃষ্ণার্ত হয়ে প্রত্যহই এখানে আসবে আর তার ফলে আমাদের কুল নির্মূল হয়ে যাবে!' তা শুনে বিজয় বলে এক বৃদ্ধ শশক বলল, 'হতাশ হোয়ো না, আমি এর একটা প্রতিকার করব।' এই প্রতিজ্ঞা করে সে বেরিয়ে পড়ল; যেতে যেতে সে মনে মনে ভেবে নিল, হাতীদের দলপতির কাছে গিয়ে কী ভাবে সে কথাটা বলবে। যে হেতু—

হাতী মারে স্পর্শমাত্র করি, সাপ মারে ঘ্রাণমাত্র নিয়া,
রাজা মারে প্রসাদ বিতরি, খল মারে হাসিয়া হাসিয়া।

সে ভাবল আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এই যূথপতিকে অভিবাদন করব।

সে তাই করল। হাতীদের দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে হে? কোথা থেকে এসেছ?' শশক বলল, 'আমি দূত। ভগবান চন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' হস্তীরাজ বললেন, 'কি করতে হবে, বলো।'

শশক বলল—

'নিত্যই অবধ্য দূত—কয় সিধা কথা;
শস্ত্র উঠালেও তার হয় না অন্যথা।

তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, শুনুন। চন্দ্রদেব বলে দিয়েছেন, 'এই শশকরা হচ্ছে আমার চন্দ্রসরোবরের রক্ষক। এদের স্থানচ্যুত করে তুমি ঠিক কাজ কর নাই। আমার সরোবর-রক্ষক এই শশকরা আমার জীব বলেই তো আমার 'শশাঙ্ক' নাম।'

দূত একথা বলতেই হস্তীরাজ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'প্রভু, না-জেনে এ কাজ করে ফেলেছি।—আর ওদিকে যাব না।'

দূত বলল, 'তাহলে, সেই জলাশয়ে যিনি ক্রোধে-কম্পমান হয়ে রয়েছেন সেই ভগবান্ চন্দ্রদেবকে প্রণতি ক'রে তাঁকে তুষ্ট করুন। তারপর, চলে যান।'

শশক বিজয় রাত্রিকালে সেই দলপতি হাতীকে সেই সরোবরে নিয়ে গিয়ে, তার জলে চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব কাঁপছিল তাকে প্রণাম করতে বলল। চন্দ্রের ছায়াকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'ভগবন্, ইনি অজ্ঞানে অপরাধ করে ফেলেছেন, সুতরাং এঁকে ক্ষমা করা উচিত। আর কখনো করবেন না।' এই বলে সে হস্তীরাজকে বিদায় দিল।

এই জন্যই বলছিলাম—

রাজা হলে বলশালী, নামে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।
শশীর নামের গুণে, শশকেরা নিরাপদে রয়।'

তারপর, আমি বললাম, 'আমাদের যিনি রাজা—সেই রাজহংস অতি প্রতাপী এবং অতীব সমর্থ। তিনি ত্রিজগতের প্রভু হওয়ার যোগ্য, রাজ্য কোন্ ছার।' তা শুনে পাখীরা আমায় বলল, 'ওরে পাজী, তুই আমাদের দেশে চরতে এসেছিস্ কেন?' এই বলে তা'রা আমাকে তাদের রাজা চিত্রবর্ণের কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজার সামনে আমাকে উপস্থিত করে তা'রা তাঁকে প্রণাম করে বলল 'মহারাজ, অবধান করুন, এই দুষ্ট বকটা আমাদের দেশে চরে বেড়ায় আর মহারাজের নিন্দা করে।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে? কোথা থেকে এসেছে?' তা'রা বলল, 'এ হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ নামক

রাজহংসের অনুচর, এসেছে কর্পূরদ্বীপ থেকে।' তখন তাদের মন্ত্রী গৃধ্র আমাকে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রী কে?' আমি বললাম, 'সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ সর্বজ্ঞ নামের চক্রবাক হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী।' গৃধ্র বলল, 'তাই তো হওয়া উচিত। তিনি ঐ দেশেরই লোক।—

দেশেতেই জন্ম যাঁর, শুদ্ধ যাঁর কুলাচার,
প্রমাণিত যাঁহার চরিত,
অব্যসনী যেই জন, ব্যাভিচারে নাই মন,
শাস্ত্রী যিনি এবং পণ্ডিত—
আছে ব্যবহার-জ্ঞান, বংশের বহু মান,
সদ্‌ভাবে অর্থাগম যাঁর—
যোগ্য মন্ত্রী তিনিই রাজার।'

এই ফাঁকে শুক বলল, 'মহারাজ কর্পূরদ্বীপ-টীপ হচ্ছে ছোট ছোট দ্বীপ; এগুলি জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত। ওখানেও মহারাজের আধিপত্য রয়েছে।' তা শুনে রাজা বললেন, 'ঠিকই তো'।—

পাগলে, রাজায়, শিশু-প্রমদায়, ধনগর্বিতে আর
না-পাবার যাহা তাও পেতে চায়, প্রাপ্য তো কোন্ ছার!

রাজার কথা শুনে আমি বললাম, 'মুখে বললেই কর্পূরদ্বীপেও যদি আপনার আধিপত্য হয়ে যায়, তাহলে এই জম্বুদ্বীপেও আমাদের প্রভু হিরণ্যগর্ভের প্রভুত্ব রয়েছে।' শুক বলল, 'তা হলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হয় কি করে?' আমি বললাম, 'যুদ্ধই হচ্ছে এর নির্ণয়।' রাজা হেসে বললেন, 'নিজের রাজাকে সাজ্‌তে বল গে।' আমি বললাম, 'আপনি আপনার দূত পাঠান্-না!' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে দৌত্যে যাবে হে?

দূত হবে রাজভক্ত, গুণী, দক্ষ, বচনেতে পটু,
পরমর্ম-উদ্ভেদী, অব্যসনী বুদ্ধিমান্ বটু।'

গৃধ্র বলল, 'হাঁ, এরকম তো অনেকেই আছেন। তবে ব্রাহ্মণকেই দূত করা উচিত। কেন না—

প্রভুরে প্রসন্ন করে, সম্পত্তি না চায়
ব্রাহ্মণ—সে অভিজাত, তাই
সাগর-মন্থন-জাত কালকূট প্রায়
কালিমা লয়েও প্রভু-প্রসাদ বাড়ায়।'

রাজা বললেন, 'তাহলে শুকই যাক্। তুমি এর সঙ্গে গিয়ে আমার ইচ্ছা জানিয়ে এস।' শুক বলল, 'মহারাজ, আপনি যা আজ্ঞা করছেন তাই হবে। তবে এটা দুর্জন বক, এর সঙ্গে আমি যাব না। কথাই আছে—

দুষ্টজনে পাপ করে, সাধু জন ভুগে মরে।
দশানন সীতা হরে, সাগর সে বাঁধা পড়ে।

পণ্ডিতরা বলেন—

থাক কিম্বা যাও যদি দুর্জনের সাথে,
জেনে রাখ, প্রাণ তব আছে তার হাতে।
কাকের সঙ্গেতে থাকি হংস প্রাণ দিল,
কাকের সঙ্গেতে গিয়া বর্তক মরিল।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কেমন?'

শুক গল্প বললেন—

হাঁস ও কাকের গল্প

উজ্জয়িনী যাওয়ার পথে যে প্রান্তর পড়ে, সেখানে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ আছে। সেই গাছে এক হাঁস আর এক কাক বাস করত। একবার, গ্রীষ্মের দিনে, এক পথিক পরিশ্রান্ত হয়ে সেই গাছের তলে, পাশে তীরধনু রেখে, ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তার মুখের উপর থেকে ছায়া সরে গেল। তার মুখের উপর রোদ পড়ছে দেখে, সেই অশ্বত্থগাছে যে পুণ্যাত্মা নিষ্পাপ হংসরাজ থাকতেন, তিনি দয়াবশে তাঁর পক্ষদ্বয় মেলে দিয়ে তার মুখের উপর

ছায়া করলেন। পথ হেঁটে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পথিকটি মুখখানা হাঁ করে বেঘোরে নিদ্রা দিচ্ছিল। এখন, কাক হচ্ছে স্বভাবতঃই দুর্জন, অন্যের সুখ তার সহ্য হয় না। সে ঐ পথিকের হাঁ-করা মুখে গূ করে পালিয়ে গেল। তাতে পথিক জেগে উঠল। সে উপরের দিকে চেয়ে, দেখতে পেল সেই হংসরাজকে। দেখেই তাঁকে তীর দিয়ে মেরে ফেলল।

থাক যদি দুর্জনের সাথে প্রাণ তব আছে তার হাতে।—

এই জন্যেই তো বিজ্ঞলোকে বলেন—

দুর্জনের সঙ্গ ছাড়ো, সাধু দেখি সঙ্গ করো তার।
পুণ্য করো দিবারাত্র, নিত্য স্মরো, অনিত্য সংসার।

মহারাজ, এবার বর্তকের কাহিনীটা বলছি, শুনুন—

কাক ও ভারুই পাখীর গল্প

এক কাক এক গাছের শাখায় এসে ঘুমাত। এক ভারুই সেই গাছের নীচে মাটিতে বাস করত। একবার পাখীরা ভগবান্ গরুড়ের পূজার উপলক্ষে সমুদ্রতীরে যাচ্ছিল। কাককে সঙ্গে নিয়ে ভারুইও যাত্রা করল। ঐ পথ দিয়ে এক গোয়ালা চলছিল। তার মাথায় ছিল একটা দধিভাণ্ড। কাকটা বারবার তার দই খেয়ে যাচ্ছিল। গোয়ালা তার ভাঁড়টা মাটিতে নামিয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখতে পেল ঐ কাক আর ভারুইকে। গোয়ালা দেখছে দেখেই কাক পালিয়ে গেল। ভারুই বেচারা স্বভাবতঃ নিরীহ, তার উপর সে মন্থরগতি, তাই গোয়ালা তাকেই ধরতে পেরে, মেরে ফেলল।

এই জন্যই বলছিলাম—

'যাও যদি দুর্জনের সাথে প্রাণ তব আছে তার হাতে।'

আমি বললাম, 'ভাই শুক, এ কী বলছ তুমি? আমার কাছে, মহারাজও যেমন, তুমিও তেমনি।' শুক বলল, 'তা হোক্, তবু—

হাসি মুখে মিঠা কথা দুর্জনে কহিলে,
—অকালের ফুল যেন—চমকায় পীলে।—

যে ভাবে তুমি কথা কও, তা থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, তুমি দুর্জন। দু'জন রাজার মধ্যে এই যে ঝগড়া বাধল, এর মূল কারণ হল—তোমার ঐ মুখের বচন।

তারপর ওদের রাজা আমাকে যথারীতি আদর-আপ্যায়ন করে বিদায় দিলেন। শুকও আমার পিছু পিছে এসে যাচ্ছে। এ সব জেনে, কী করা যায় অবধারণ করুন।

মন্ত্রী চক্রবাক বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'মহারাজ, বক তো দেশান্তর গিয়ে যথাশক্তি রাজকার্য করে এলেন, তবে কিনা মূর্খদের স্বভাবই এমনি। কেন না—

কিছু যদি যায় যাক্, কি কাজ কলহে?—কয় বিজ্ঞজনে।
মূর্খের লক্ষণ হল বিবাদ বাধানো স্রেফ্ অকারণে।'

রাজা বললেন, 'যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে তিরস্কার করে লাভ নাই, এখন কী করা যায় তাই ঠিক কর।'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, একান্তে বলব কারণ—

লখিয়া মুখের রঙ, লখিয়া আকার,
নিরখিয়া চোখের ও মুখের বিকার,
বুদ্ধিমানে মনোভাব করে অনুমান।
সুতরাং নির্জনই মন্ত্রণার স্থান।'

তারপর, রাজা আর মন্ত্রী সেখানে থেকে গেলেন, অন্যেরা সরে গেল। চক্রবাক বলল 'মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, আমাদেরই কোনো কর্মচারীর প্রেরণাতেই বকটা এ কাজ করেছে।

কারণ,—

বৈদ্যমশায় চায়—রোগ ঘরে ঘরে,
মনিবের নেশাসক্তি চাহেই চাকরে।
পণ্ডিত মূর্খকে চায় দুহিবার তরে,
প্রজাদের বিবাদিতা রাজা বাঞ্ছা করে।'

রাজা বললেন, 'তা হোক্, কারণ নিরূপণ করা যাবে পরে, এখন কী কর্তব্য তাই বল।' চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, তাহলে সেখানে একটা গুপ্তচর পাঠানো হোক্। তার কাছ থেকে আমরা ওদের যুদ্ধ-আয়োজন ও বলাবলের সংবাদ পাব। কথাই আছে—

চোখ নাই সে রাজার নাহিক যাঁহার চার।
নিজ বা পরের রাজ্যে কী হয় না-হয়—
রাজার দেখার চোখ চরই নিশ্চয়।

সে বিশ্বস্ত দেখে আর-একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাক্। নিজে সেখানে থেকে, যে সব গুপ্তমন্ত্রণাদি সে-রাজ্যে চলেছে তা গোপনে জেনে নিয়ে, সে আমাদের কাছে দ্বিতীয় লোকটিকে পাঠিয়ে দেবে। পণ্ডিতরা বলেন,—

তীর্থে আশ্রমে আর বড় দেবালয়ে
শাস্ত্র-আলোচন-রত সাধুজির বেশে
বিদেশের গুপ্ত তথ্য যত্নে জানি লয়ে
অন্য-চর মুখে তাহা পাঠাবে সে দেশে।

গুপ্তচর যে হবে তাকে জলে স্থলে চরতে হবে। সুতরাং ঐ বককেই নিযুক্ত করা যাক্। অমনি আর কোনো বক ওর সঙ্গে যাক। ওদের পরিবারবর্গ জামীন-স্বরূপ রাজদ্বারে থাকুক্। কিন্তু মহারাজ এ কাজও অতিগোপনে করা চাই। কেন না,—

যুদ্ধ যখন নাই, বীর তো সবাই।
শত্রুবল না জানিয়া দর্প কার নাই?

অবশ্য—

পাথর ওঠানো যায় নীচে বাঁশ দিলে,
অল্পোপায়ে মহাসিদ্ধি মন্ত্রণায় মিলে।"

কিন্তু—যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে দেখে কর্তব্য স্থির করা চাই, কারণ,—

বিপদ যখন আছে দূরে, হওয়া উচিত সাবধানী।
বিপদ যখন এসে গেছে, বীরত্বকেই গুণ মানি।
বিপদ মাঝে প্রাজ্ঞ চলে ধৈর্য ধরি, এই জানি।

এ কথা তো ঠিক যে—

সকল প্রকার কর্মে—
উত্তাপই মহা অন্তরায়,
যতই শীতল হোক্,
জল দেখো মাটি কেটে যায়।

বিশেষতঃ, এই রাজা চিত্রবর্ণ হচ্ছেন মহাবল। যেহেতু—

বলীর সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে, কোথায় এমন নিদর্শন।
হাতীর সঙ্গে লড়লে পরে, মানুষ শুধু পায় মরণ।

কোনো সন্দেহ নাই যে—

সময় না হতে, বলীর সহিত লড়াই করিতে ছোটা
মূর্খেরই সাজে। হায় রে, সে যেন পিঁপড়ের পাখা-ওঠা!

এ কথাও ঠিক—

কূর্ম নীতিজ্ঞ বড়,
এম্‌নি খোলেতে থাকি কতো মার খায়,
সুযোগ পেতেই কিন্তু,
ক্রূর সর্পের মত মোক্ষম দংশায়।

মহারাজ, শুনুন—

জানিলে উপায়,
ছোট হোক্, বড় হোক্, শত্রু-মারা যায়।
নদীজলবেগ
তৃণের মতই বৃক্ষে যথা উপ্‌ড়ায়।

তাই বলছি, আমাদের দুর্গ যতদিন না সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে ততদিন ওদের দূত এই শুককে মিথ্যা কথা বলে ধরে রাখা যাক্।—

এক যুঝে শত সাথে, থাকিলে সে দুর্গের ভিতর।
শত শত যোদ্ধা হতে দুর্গ তাই জানি শ্রেষ্ঠতর।

জানেন তো,—

দুর্গহীন হলে রাজা, তাঁকে কে না পরাভূত করে ?
অদুর্গ তো অনাশ্রয়,—পোতহীন মানুষ সাগরে।

দুর্গটা কেমন হওয়া উচিত তাও শুনে রাখুন—

দুর্গের পরিখা রবে, রহিবে প্রাকার,
যন্ত্র রবে যথাযোগ্য, রবে জলাধার,
মরু কিংবা বন রবে সীমায় তাহার,
অথবা বৃহৎ নদী, অথবা পাহাড়।
দুর্গ হবে সুবিস্তীর্ণ, সুবিষম আর,
ধান্য, জল, কাষ্ঠ তাহে রহিবে সঞ্চিত,
প্রবেশের নির্গমের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার
প্রহরিগণের দ্বারা হবে সুরক্ষিত।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুর্গের স্থান নিরূপণের জন্যে কাকে নিযুক্ত করা যায় ?'

চক্রবাক বলল—

'যে-কাজ যে ভালো জানে, সে-ই করুক্।
হোক্-না শাস্ত্রজ্ঞ বড়, আনাড়ীর হয় ভুলচুক।

সুতরাং সারসকে ডাকা যাক।'

তাই করা হল। সারস এলে তাকে দেখে রাজা বললেন, 'সারস, সত্বর দুর্গরচনার জন্যে উপযুক্ত একটা স্থান দেখ দেখি।'

সারস প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, এই মহা সরোবরই তো বহুকাল থেকে ভালো দুর্গ বলে নিরূপিত হয়ে আসছে। তবে এর মধ্যভাগে যে দ্বীপ আছে তাতে প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ,—

ধানের সঞ্চয়ই হল প্রধান সঞ্চয়,
রতন ভোজনে কারও প্রাণ নাহি রয়।

সকল রসের সেরা রস লবণের ;
লবণ-অভাবে স্বাদ কিবা ব্যঞ্জনের ?'

রাজা বললেন, 'শীঘ্রি গিয়ে সব ঠিক করে ফেল।'

এমন সময় প্রতিহারী এসে বলল, 'মেঘবর্ণ বলে এক কাক সিংহল থেকে এসে দ্বারদেশে অপেক্ষা করছে। মহারাজের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।'

রাজা বললেন, 'কাক হচ্ছে প্রাজ্ঞ জীব ; তার অনেক কিছু দেখা-শোনা আছে, সুতরাং তাকে আমাদের পক্ষে জুটিয়ে নেওয়া যাক্।'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ। হোক সে প্রাজ্ঞ, হোক সে বহুদর্শী, কাক যে আমাদের শত্রুজাতীয় স্থলচর পাখী! তাকে কি ক'রে স্বপক্ষে জুটিয়ে নেবেন ? পণ্ডিতরা বলেন, —

আত্মপক্ষ ত্যাগ করি কেহ যদি পরপক্ষে যায়,
সে-মূর্খ নিহত হয় —নীলবর্ণ শৃগালের প্রায়।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?' মন্ত্রী গল্প বললেন—

নীলবর্ণ শৃগালের গল্প

এক শৃগাল তার খুশীমত নগরের এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোনো ধোপার নীল-রসের জালার মধ্যে পড়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও জালা থেকে উঠতে না পেরে, সে মরার ভাণ করে তার মধ্যেই পড়ে থাকে। সকাল হলে, সেই জালার মালিক তাকে মৃত ভেবে, জালা থেকে তুলে দূরে ফেলে দেয়। শৃগাল তখন বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে, নিজের নীল রঙ দেখে মনে মনে চিন্তা করল—এবার আমার খাসা রঙ হয়েছে, এমন রঙ নিয়ে নিজের উন্নতি করে নিই না কেন ? এই ভেবে, সে শৃগালদের ডেকে এনে গম্ভীর ভাবে বলল, 'ভগবতী বনদেবী নিজের হাতে সব রকম গাছ-গাছড়ার রসে আমাকে এই

অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, আমার রঙ দেখেই তা বুঝতে পারছ তোমরা, সুতরাং আজ থেকে তোমাদের উচিত আমার আজ্ঞা পালন করে চলা।'

শৃগালরা তার সেই বিশিষ্ট বর্ণ দেখে তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে

বলল, 'মহারাজ যেমন আদেশ করবেন তাই হবে।' এই ভাবে কালক্রমে নীল-রঙা শৃগাল সমস্ত অরণ্যবাসীর অধিপতি হয়ে উঠল। এই ভাবে স্বজাতিবেষ্টিত হয়ে সে নিজের উন্নতি করে নিল বটে, কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি উত্তম জাতির মন্ত্রীদের পেয়ে, সভার মধ্যে সেই শৃগালদের দেখে, তার লজ্জা করতে লাগল। সে স্বজাতির সকলকে অবজ্ঞাভরে দূরে রাখতে লাগল। শৃগালরা ক্ষুণ্ণ হল। তাদের বিষণ্ণ দেখে, এক বৃদ্ধ শৃগাল তাদের আশ্বাস দিল 'তোমরা দুঃখ কোরো না। আমরা সব আসল রহস্যটা জানি তা সত্ত্বেও এই নীতি-জ্ঞানহীন মূর্খ যখন আমাদের অবজ্ঞা করেছে, তখন এর যাতে ধ্বংস হয় তাই করতে হবে। এই বাঘ-টাঘগুলো শুধু এর রঙ দেখেই ভুলেছে; এ যে শৃগাল, তা জানে না। তাই একে রাজা বলে মানে। সুতরাং এর সত্য পরিচয়টা যাতে বেরিয়ে পড়ে তা করতে হবে। আমি যা বলি, তাই করো। সন্ধ্যার সময়ে তার কাছাকাছি থেকে আমরা সকলে মিলে ডাক ছাড়ব। সে-শব্দ কানে যাওয়া মাত্র জাতিস্বভাববশে তারও ডাক ছাড়া উচিত। কারণ—

যার যা স্বভাব তাহা সহজে কি ঝেড়ে ফেলা যায়?
কুকুরে করিলে রাজা, তবু সে তো জুতা চেটে খায়।

তাই বলছি, শব্দ শুনে বাঘ ওর পরিচয় পা'ক। বাঘের হাতেই ওর মরা উচিত।'

তার পরামর্শ মত কাজ করা হল। নীলবর্ণ শৃগাল মারা পড়ল। লোকে ঠিকই বলে—

সব ছিদ্র, সব তথ্য, সব বল-ই—গৃহশত্রু জানে,
বৃক্ষে যথা দাবানল, সুনিশ্চিত মৃত্যু বহি আনে।

তাই বলছিলাম—

'আত্মপক্ষ ত্যাগ করে কেহ যদি পরপক্ষে যায়,
সে মূর্খ নিহত হয়, নীলবর্ণ শৃগালের প্রায়।'

রাজা বললেন, 'তা হোক, তবু এ দূর থেকে এসেছে। একে দলে ভিড়ানোর কথাটা বিচার করা উচিত। এর সঙ্গে দেখা করা যাক্-না।'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, চর পাঠানো হয়েছে। দুর্গও সাজানো হয়েছে, সুতরাং শুককেও আনানো হোক। তবে সৈন্যদের সঙ্গে রেখে, দূর থেকে তার সঙ্গে দেখা করুন। কারণ—

চাণক্য করিল বধ নন্দ নৃপতিরে
প্রয়োগ করিয়া তাঁর দূত সুচতুর।
শত্রুদূত সাথে রাজা করিলে আলাপ;
রক্ষী যেন পাশে রয়, দূত থাকে দূর।'

রাজসভা বসানো হল, শুক আর কাককে ডাকা হল। শুক খানিকটা উঁচুমাথা করেই রাজদত্ত আসনে গিয়ে বসল, বলল, 'ওহে হিরণ্যগর্ভ, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ চিত্রবর্ণ তোমাকে বলে পাঠিয়েছেন, "যদি প্রাণে বেঁচে রাজ্য নিয়ে থাকতে চাও, তাহলে অবিলম্বে আমার চরণে এসে প্রণাম করো ; নইলে থাকার অন্য কোনো স্থানের কথা চিন্তা করো।"

তা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আঃ, আমাদের সভায় এমন কেউ কি নাই যে এটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র করে দেয় ?'

অমনি কাক মেঘবর্ণ উঠে বলল, 'মহারাজ আদেশ করুন, এই দুষ্ট শুককে এখনই মেরে ফেলি।'

মন্ত্রী চক্রবাক বিজ্ঞ ; সে রাজাকে আর কাককে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বলল, 'ভদ্র, এমন কাজই করবেন না। শুনুন—

সে-সভা সভাই নয় যে সভায় নাই বৃদ্ধগণ।
সে-বৃদ্ধেরা বৃদ্ধ নয় ধর্ম কথা যারা নাহি ক'ন।
সে-ধর্ম তো নামে ধর্ম সত্যে যাহা প্রতিষ্ঠিত নয়।
সে-সত্য নামেই সত্য রয়ে গেছে যাহাতে সংশয়।

রাজধর্ম হচ্ছে এই—

ম্লেচ্ছ হলেও দূত কভু বধ্য নয় ;
রাজার মুখের কথা সে তো শুধু কয়।
উদ্যত হলেও অসি, অন্যথা না হয়।

ভেবে দেখুন—

আপনাকে ছোট আর শক্রকে বড়,
দূতের কথায় কেউ মানে ?
নিজেরে অবধ্য জেনে দূত বলে যায়,
বাধা তার আছে কোনখানে ?'

চক্রবাকের কথা শুনে রাজা আর কাক প্রকৃতিস্থ হলেন। শুকও উঠে চলে গেল। পরে চক্রবাক তাকে ডেকে, মিষ্ট বাক্যে প্রসন্ন করে, কনক অলঙ্কারাদি উপহার দিয়ে বিদায় দিল।

শুক বিন্ধ্যাচলে ফিরে গিয়ে নিজের রাজা চিত্রবর্ণকে প্রণাম করল। তাকে দেখে রাজা চিত্রবর্ণ বললেন, 'শুক, বার্তা কি ? সে দেশটা কেমন দেখলে ?'

শুক বলল, 'মহারাজ, সংক্ষেপে সংবাদ হচ্ছে এই যে, এখন যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। ওই কর্পূরদ্বীপটা যেন স্বর্গ, সেখানকার রাজা যেন দ্বিতীয় স্বর্গপতি। কি করে সে সব বর্ণনা করি !'

তারপর সমস্ত বিজ্ঞদের আহ্বান করে রাজা তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসলেন, তাদের বললেন, 'যুদ্ধ করতেই হবে, তার জন্যে কী করা উচিত বলো। কথাই আছে—

অসন্তুষ্ট হলে দ্বিজ, পান তিনি কষ্ট।
সন্তুষ্ট হলেই নৃপ, হন তিনি নষ্ট।'

মন্ত্রী দূরদর্শী নামে গৃধ্র বলল, 'মহারাজ, ক্রোধাদির বশে যুদ্ধ করা বিধেয় নয়। কারণ—

মিত্র-মন্ত্রী-সৈন্য আদি অনুকূল যবে আপনার,
শক্র পক্ষে তার বিপরীত সময় সে যুদ্ধ বাধাবার।

কে না জানে যে—

ভূমি-মিত্র-স্বর্ণ-লাভ তরে
রাজা যুদ্ধ করে।
তিনলাভই হলে সুনিশ্চিত
বিগ্রহ বিহিত।'

রাজা বললেন, 'তাহলে মন্ত্রী মশায় আমার সৈন্যদের তদারক করুন, তাদের উপযুক্ততা যাচাই করা হোক। তারপর, দৈবজ্ঞকে ডাক দেওয়া হোক, সে এসে যুদ্ধযাত্রার একটা শুভলগ্ন দেখে দিক।'

মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, ধরা গেল, আমরা যুদ্ধ করতে পারি, তবু সহসা যুদ্ধযাত্রা করাটা ঠিক হবে না। কারণ,—

না জানিয়া শত্রুবল, সহসা যে বিগ্রহ বাধায়,
সে মূর্খের মরণ নিশ্চিত শত্রু-খড়্গ-ঘায়।'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রিবর, আমার উৎসাহ-ভঙ্গ করা কোনক্রমেই তোমার উচিত নয়। জয়াকাঙ্ক্ষী যাতে পরদেশ আক্রমণ করতে পারে, সেই রকম উপদেশ করো।'

গৃধ্র বলল, 'মহারাজ, তাই তো বলছি। কিন্তু সেই মত কাজ হলেই ফল পাওয়া যাবে। পণ্ডিতরা বলেন—

মন্ত্রণায় কিবা লাভ, নাহি যদি হয় অনুষ্ঠান ?
ব্যাধিশান্তি করে কভু শুধুমাত্র ঔষধের জ্ঞান ?

রাজাদেশ অনতিক্রমণীয় ; তাই যথাশাস্ত্র আমি নিবেদন করছি। মহারাজ, শুনুন—

গিরি, নদী, বন, দুর্গ—যেথা যেথা ভয়—
ব্যূহ রচি সেনাপতি যাবেন নিশ্চয়।

উপ-সেনাপতি অগ্রে, লয়ে বীরদল ;
মধ্যে নারী, রাজা, কোষ, সৈনিক দুর্বল।

দুইপাশে পর পর, অশ্ব, রথ, হাতী ;
হস্তীসৈন্যদের পাশে রহিবে পদাতি।

উৎসাহী ভীতচিত্ত যত সৈন্যগণে
সেনাধ্যক্ষ মন্দগতি যাবেন পিছনে।

এভাবে কটক তাঁর করিয়া সজ্জিত
চলিবেন রাজা মন্ত্রী-প্রবীর-বেষ্টিত।

পার্বত্য, বিষম কিম্বা জলাকীর্ণ ঠাঁয়
হস্তীসৈন্য হবে তাঁর প্রধান সহায়;
সমভূমে অশ্বসৈন্য; জলে নৌসেনায়,
সর্বত্র পদাতি লয়ে যুদ্ধ করা যায়।

বর্ষাগমে হস্তী লয়ে প্রশস্ত গমন;
তুরঙ্গম অন্যকালে; সদা পত্তিগণ।

পাহাড়ে, দুর্গম পথে, বড় সাবধান,
যোগী সম রাজা যেন সেথা নিদ্রা যান

বুনোদের অগ্রে রাখি যেন শত্রুদেশ
অতি সন্তর্পণে রাজা করেন প্রবেশ।
তাহার কটক দুর্গ আক্রমণ করি
সম্পূর্ণ নিধন যেন করে যান অরি।

রাজকোষ-ছাড়া রাজা রাজা গণ্য নয়।
যোদ্ধাদের ঠিকমত ধন দিতে হয়;
ধনই সবে করে বশ; অর্থের কারণ
সৈন্যেরা রণভূমে করে প্রাণপণ!

তার কারণ,—

মানুষ নহেকো দাস অন্য মানুষের;
ধনকে যে প্রভু মানে, প্রভুত্ব ধনের।
মানুষ গৌরব পায় ধনযুক্ত ব'লে
লঘুতা তাহার ঘটে ধনহীন হ'লে।

পরস্পরে রক্ষা করা, এক হয়ে লড়া,
কর্তব্য দুর্বল সেনা ব্যূহমধ্যে ভরা,
লাগানো বাহিনী-অগ্রে পদাতিক সব,
শত্রুকে ঘেরা, করা রাজ্যে উপদ্রব।

রথ ও অশ্বের যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সমতলে,
হস্তী-নৌকার যুদ্ধ সুপ্রশস্ত জলে ;
বৃক্ষগুল্মাবৃত স্থানে চাপই হাথিয়ার,
অন্যস্থানে অস্ত্র হল ঢাল-তলোয়ার।

শত্রুদের অন্ন ঘাস ইন্ধন ও বারি
দূষিত যাহাতে হয়, চেষ্টা রবে তারি।
তাদের তড়াগ, তথা পরিখা প্রাকার
ব্যবস্থা করিতে হবে নষ্ট করিবার।

অশ্বাদি বলের মধ্যে প্রমুখ বারণ,
অষ্টাঙ্গই তার যেন অষ্ট প্রহরণ।
অশ্ববল বাহিনীর চলন্ত প্রাকার,
অশ্ব যাঁর বেশী, স্থলে জয় সে রাজার।

অশ্বারোহী সৈন্যদল দেবেরও দুর্জয়,
দূরস্থ শত্রুও তার মুষ্টিমধ্যে রয়।
চতুরঙ্গসেনা-রক্ষা নৈপুণ্যের সার,
দিঙ্‌মার্গে বিঘ্ননাশ পদাতির ভার।

স্বভাবসাহসী, অস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল,
রাজভক্ত, জিতশ্রম ক্ষত্রিয়ই বল।

বহু ধন পেয়ে লোকে যেমনটি লড়ে,
তার চেয়ে বেশী যুঝে প্রভু-সমাদরে।

অল্প বীর-সৈন্য ভালো, বহু ভীরু নয়,
ভীরুর পালানো দেখি বীরও পায় ভয়।

সৈন্যদের প্রতি রাজা যদি রূঢ় হন,
যুদ্ধকালে সৈন্যমধ্যে নাহি যদি র'ন,
লুণ্ঠিত ধনের অংশ তাদের না দেন,
কার্যকালে অকারণ বিলম্ব করেন,
বিপদের প্রতিকারে তৎপর না হন,
সৈন্যদের ছত্রভঙ্গে লাগে কতক্ষণ ?

পথশ্রান্ত সৈন্যনাশ সুখসাধ্য অতি,
জিগীষু রাজার যাত্রা তাই ধীরগতি।

জ্ঞাতিবর্গ-সম কেবা আছে ভেদকর ?
সযত্নে ভেদিতে হয় অরাতির ঘর।
সন্ধি করি যুবরাজ কিম্বা মন্ত্রী সাথে,
শত্রুপক্ষে অন্তর্দ্রোহ হইবে ঘটাতে।

যুদ্ধ ত্যজিয়াও ভালো খলমিত্রে নাশ,
বাঁধি মুখ্যাশ্রিতে তার, পরায়ে গোফাঁস

শত্রুরাজ্য ভাঙি, কিম্বা দিয়া দান-মান,
নিজরাজ্যে প্রজা যেন নৃপতি বসান।

আর বেশী বলার কি প্রয়োজন ?—
আত্মোদয়, শত্রুহানি—মাত্র দুটি নীতি।—
এ নিয়েই বাচস্পতি হন যত কৃতী।'

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, 'সবই সত্য, কিন্তু—
উচ্ছৃঙ্খল জীব মানে শাস্ত্রের বিধান ?
একত্র আঁধার আলো করে অবস্থান ?'

কিছু পরে, রাজা উঠে পড়লেন। দৈবজ্ঞ যে সময় নির্দেশ করে দিয়েছিলেন সেই লগ্নে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন।

গুপ্তচরের পাঠানো লোক এসে হিরণ্যগর্ভকে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল, 'মহারাজ, রাজা চিত্রবর্ণ সমাগতপ্রায়, এখন তিনি মলয়

পর্বতের উপত্যকায় শিবির সংস্থাপন করে রয়েছেন। এখনই দুর্গ-সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হয়, কারণ, গৃধ্র হচ্ছেন ওঁর মহান্ মন্ত্রী। আর, একজনার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের কথা নিয়ে আলোচনা করার সময় এই রকম একটা ইঙ্গিত পেয়েছি যে, তিনি পূর্ব হতেই আমাদের দুর্গে কে একজনকে নিযুক্ত করে রেখেছেন।'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, সে, বোধ হয়, ওই কাকটা।'

রাজা বললেন, 'তা কখনই হতে পারে না। তাই যদি হয়, তবে সে শুককে মারতে উঠেছিল কেন? তা ছাড়া, শুক আসার ফলেই তার যুদ্ধে উৎসাহ; কাক তো অনেক আগে থেকে এখানে রয়েছে।'

মন্ত্রী বলল, 'তবু, নতুন-আসা লোককে সন্দেহ করা উচিত।'

রাজা বললেন 'আগন্তুকদেরও কখনো কখনো উপকারক হতে দেখা যায়। শোনো—

শত্রুও বন্ধু হয়, হিত করে থাকে,
বন্ধুও অহিত করে, শত্রু হয়ে যায়।
নিজ দেহে জন্মে রোগ—বন্ধু ক'ব তাকে?
ঔষধ কি শত্রু হয়—বনে তো জন্মায়?

জান তো—

বীরবর—সে শূদ্রকের পরিজন ছিল—
স্বল্পকালে নিজপুত্রে বিসর্জন দিল।'

চক্রবাক জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম?' রাজা গল্প করলেন—

রাজা শূদ্রক ও বীরবরের কাহিনী

এককালে আমি রাজা শূদ্রকের কেলিসরোবরে কর্পূরকেলি বলে এক রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। সে-সময় বীরবর বলে এক রাজপুত্র কোন এক দেশ থেকে এসে রাজদ্বারের দারোয়ানকে বলে, 'আমি রাজপুত, জীবিকাসন্ধানে এসেছি, আমাকে রাজদর্শন করাও।'

দারোয়ান তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলে সে বলল, 'যদি আমাকে সেবক রাখতে চান, তাহলে আমার একটা বেতন স্থির করুন।'

শূদ্রক বললেন, 'কি বেতন চাও?'

বীরবর বলল, 'প্রতিদিন চারশত সুবর্ণ মুদ্রা।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আছে কী?'

বীরবর উত্তর দিল, 'এই দুই বাহু, আর এই খড়্গ।'

রাজা বললেন, 'আমার শক্তিতে কুলাবে না।' তা শুনে, বীরবর প্রণাম করে বিদায় নিল।

বীরবর চলে যাচ্ছে দেখে, মন্ত্রীরা বলল, 'মহারাজ, দিন চারেকের বেতন দিয়ে এর স্বরূপটা জানা ভালো। এত যে বেতন নেবে এ তার উপযুক্ত, না, অনুপযুক্ত সেটা দেখা যাক-না।' তাদের পরামর্শ শুনে রাজা শূদ্রক বীরবরকে ডেকে তাকে তাম্বুল দিয়ে আদর করে তার-চাওয়া বেতনই দিতে রাজী হলেন।

বীরবর তার এই বেতনটা কী ভাবে নিয়োগ করে, রাজা সেটা গোপন-গোপনে জেনে নিলেন। বীরবর তার বেতনের অর্ধেক ব্যয় করত দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সেবায়; বাকী অর্ধের অর্ধাংশ দিত দরিদ্রদের। তারপর যা অবশিষ্ট থাকত সেটুকু ব্যয় করত নিজের খাওয়া-দাওয়ায়, বিলাসে। এই সব নিত্যকৃত্য ক'রে, সে দিনরাত খড়্গ হাতে রাজদ্বারে প্রহরা দিত। রাজা স্বয়ং যখন তাকে যেতে বলতেন, তখনই সে নিজের বাড়ী যেত।

সেটা ছিল কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রি। একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কে দ্বারী আছে হে?'

বীরবর উত্তর দিল, 'মহারাজ, আমি বীরবর।'

রাজা বললেন, 'ঐ কে কাঁদছে, গিয়ে দেখে এসো।'

বীরবর বলল, 'যে আজ্ঞা, মহারাজ' এই বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

রাজা ভাবলেন, 'এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে এই রাজপুতকে একাকী পাঠালাম; এটা উচিত হল না। আমিও গিয়ে দেখে আসি, কী
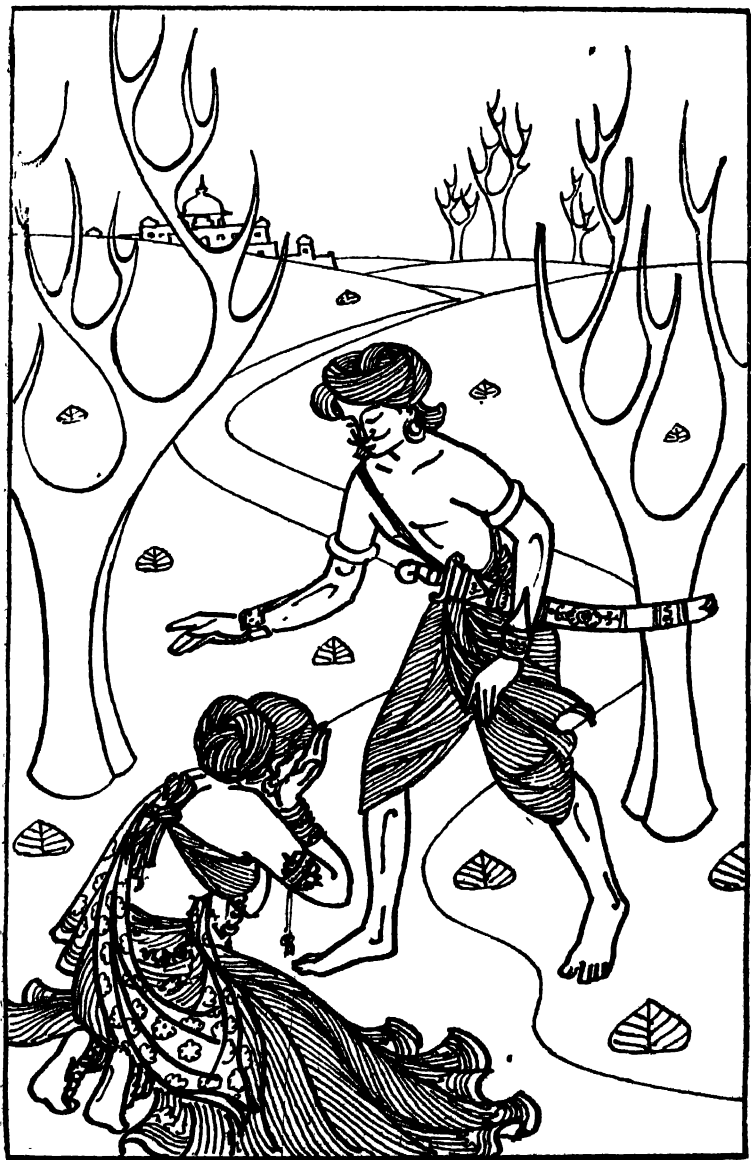
ব্যাপার।' এই ভেবে রাজাও খড়্গ নিয়ে তার পিছু পিছু নগরের বাইরে চলে গেলেন।

বীরবর গিয়ে দেখল, এক রূপযৌবনসম্পন্না, সর্বালংকারভূষিতা

স্ত্রীলোক কাঁদছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? কাঁদছেন কেন?'

স্ত্রীটি বললেন, 'আমি এই রাজা শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী; বহুকাল এর ভুজচ্ছায়ায় মহাসুখে বিশ্রাম করেছি। রাণীর অপরাধে, আজ থেকে তিন দিনের দিন, রাজা মারা যাবেন। আমি অনাথা হব। এখন আর এখানে থাকা হবে না। তাই কাঁদছি।'

বীরবর বলল, 'বিপত্তি যেখানে আছে, সেখানে তার প্রতিকারও নিশ্চয়ই আছে। কী করলে দেবীর এখানে পুনরায় অবস্থান সম্ভব হয়, তা বলুন।'

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'তোমার পুত্র শক্তিধরের মধ্যে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণই রয়েছে। যদি তুমি তার মাথাটা নিজের হাতে কেটে ভগবতী সর্বমঙ্গলাকে উপহার দাও, তাহলে রাজা শতায়ুঃ হন, আমিও দীর্ঘকাল সুখে থাকতে পারি।' এই বলে তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

বীরবর তখন নিজের বাড়ী গিয়ে নিদ্রাভিভূতা স্ত্রী ও পুত্রকে জাগাল। তা'রা নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে বসল। বীরবর তাদের সেই রাজলক্ষ্মীর কথা সমস্তটাই বলল। তা শুনে, শক্তিধর সানন্দে বলে উঠল, 'ধন্য আমি, রাজার রাজ্যরক্ষার জন্যে আমার উপযোগ দেখা দিয়েছে! বাবা, এখন আর বিলম্ব-করা কেন? এই দেহটা এ-হেন কাজে যদি লেগে যায়, তার চেয়ে শ্লাঘ্য আর কী হতে পারে? কারণ,—

পরার্থেই প্রাণ ধন প্রাজ্ঞে করে সমর্পণ।
ত্যাগই শ্রেয়ঃ, শুভকর্মে সুনিশ্চিত বিনাশ যখন।'

শক্তিধরের মা বলল, 'এটা যখন আমাদের কুলোচিত কর্ম, তখন এ না করলে রাজদত্ত জীবিকার ঋণ আমরা শোধ করব কী করে?'

এই সব আলোচনা করে তা'রা সব সর্বমঙ্গলা-মন্দিরে গেল। সেখানে সর্বমঙ্গলাকে পূজা করে বীরবর বলল, 'দেবী, প্রসন্ন হোন, মহারাজ শূদ্রকের জয় হোক, আপনি এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।' এই

বলে সে পুত্রের শিরশ্ছেদ করল। তারপর, বীরবর ভাবল, 'রাজার কাছে যে বর্তন নিয়েছিলাম, তা তো পরিশোধ করা হল। এখন নিষ্পুত্রক আমার এই জীবন একটা বিড়ম্বনামাত্র।'—এই চিন্তা করে সে নিজেরও শিরশ্ছেদ করল। স্বামী আর পুত্রের শোকে তার স্ত্রীও তাই করল। এই সব দেখে শুনে শূদ্রক আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন,—

মদ্‌বিধ ক্ষুদ্রজীব জন্মে আর মরে।
এঁর তুল্য অসম্ভব এ ধরণী 'পরে।

সুতরাং এঁকে ছেড়ে আমার রাজ্য নিয়ে কী হবে?—এই ভেবে শূদ্রকও নিজের মস্তক ছেদন করার জন্য খড়্গ তুললেন। ভগবতী সর্বমঙ্গলা তখন প্রত্যক্ষ হয়ে রাজার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'পুত্র, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার এই রকম অবিমৃষ্যকারিতা নিরর্থক; এখন আর তোমার রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।'

রাজা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, 'দেবী, রাজ্য বা জীবন বা স্ত্রী নিয়ে আমার প্রয়োজন নাই। আমায় যদি অনুকম্পা করেন, তাহলে আমার আয়ুশেষেও এই রাজপুতটি পুনরুজ্জীবিত হোন। তা নইলে আমার যে-গতি হয় হোক গে।'

ভগবতী বললেন, 'পুত্র, তোমার চিত্তের এই ঔদার্য দেখে, তোমার ভৃত্যবাৎসল্য দেখে আমি সর্বথা সন্তুষ্ট হয়েছি। যাও, বিজয়ী হও। এই রাজপুতও সপরিবারে বেঁচে উঠুক।' এই বলে দেবী অদৃশ্য হলেন। বীরবর স্ত্রী-পুত্রসহ জীবিত হয়ে নিজের বাড়ী ফিরল। রাজাও তাদের অলক্ষ্যে সত্বর প্রাসাদে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বীরবর পুনরায় প্রাসাদ-দ্বারে ফিরে এল; রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'মহারাজ সেই যে স্ত্রীটি কাঁদছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ ছাড়া আর কোনো সংবাদ নাই।' তার কথা শুনে রাজা বিস্মিতভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, এই

মহাত্মা কী করে নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করবেন ? কেন না—

মহাত্মা যে জন তাঁর মধুর বচন।
তাঁর চিত্ত অদীন আত্মশ্লাঘাহীন ;
তিনি সাহসী ও শূর ;
সৎপাত্রে দাতা
আর, তিনি অনিষ্ঠুর।—

মহাপুরুষের এই লক্ষণগুলির সবই এঁর মধ্যে আছে।

তারপর, রাত্রি প্রভাত হলে, রাজা শূদ্রক শিষ্টসভা আহ্বান করে, তাঁদের কাছে সর্ববৃত্তান্ত বলে নিজ প্রসন্নতার নিদর্শন স্বরূপ বীরবরকে কর্ণাটরাজ্য দান করলেন।

এমনি যদি হয়, তাহলে আগন্তুকমাত্রকেই শত্রু মনে করা যায় কি ? তবে, তাদের মধ্যে উত্তম, অধম ও মধ্যম সম্ভব বটে।'

চক্রবাক বলল,—

'কুমন্ত্রী সে, রাজাকে তুষিতে অকার্যকে কার্য যেবা কয়।
হয় হোক ব্যথা দিতে প্রভু-চিতে ; নাশ তাঁর কাম্য কভু নয় !

জানেন তো —

বৈদ্য গুরু মন্ত্রী আর চাটুভাষী যে-রাজার,
শরীর ধর্ম ও ধন শীঘ্র নাশ হয় তাঁর।—

মহারাজ সেই কাহিনীটা জানেন তো—

পুণ্যবলে একজন যে-ধন পেয়েছে
আমারো তো পাওয়াই উচিত—
এই ভাবি মোহবশে ভিক্ষুরে বধিয়া
অর্থলোভে মরিল নাপিত।'

রাজা প্রশ্ন করলেন, 'কী রকম ?' মন্ত্রী গল্প বললেন—

নাপিত ও ভিক্ষুর গল্প

অযোধ্যাপুরীতে চূড়ামণি বলে এক ক্ষত্রিয় ছিল। সে ধনপ্রার্থী হয়ে দীর্ঘকাল ভগবান চন্দ্রশেখরের কঠোর তপস্যা করেছিল। তার পাপক্ষয় হয়ে গেলে, ভগবান মহাদেবের আদেশে যক্ষেশ্বর কুবের তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এই আদেশ করলেন—'আজ প্রভাতেই তুমি ক্ষৌর করিয়ে, হাতে লগুড় নিয়ে, নিজের গৃহদ্বারে লুকিয়ে থেকো, আর যে কোনো ভিক্ষুকে তোমার অঙ্গনে আসতে দেখবে, তাকেই নির্দয় লগুড়াঘাতে হত্যা করে ফেলো। তাহলে সেই ভিক্ষু তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ কলসে পরিণত হবে। তা দিয়ে তোমার সমস্ত জীবনটা সুখেই চলে যাবে।' সে তাই করল, আর যে রকম বলা হয়েছিল সেই রকমই ঘটল।

এখন, ক্ষৌর-করার জন্য যে নাপিতকে আনা হয়েছিল, সে এ-সবই দেখে মনে মনে চিন্তা করল, 'আঃ হা, এই তো ধনপ্রাপ্তির উপায় পাওয়া গিয়েছে। আমিই বা এই রকম না করি কেন?' সেই থেকে ঐ নাপিতটা প্রত্যহই ঐ রকম লাঠি হাতে নিভৃতভাবে ভিক্ষুদের আগমনের অপেক্ষা করত। একদিন এক ভিক্ষুকে পেয়ে সে তাকে লাঠিয়ে মেরে ফেলল। এই অপরাধে রাজপুরুষদের হাতে তাকেও প্রাণ দিতে হল।

এই জন্যই বলছিলাম—

'পুণ্যবলে একজন যে-ধন পেয়েছে,
আমারও তা পাওয়াই উচিত—
এই ভাবি মোহবশে ভিক্ষুরে বধিয়া
ধনলোভী মরিল নাপিত।'

'আপনার এই কাকটি যে শূদ্রকের বীরবরের মত হবে, তা মনে করছেন কেন?'

রাজা বললেন—

'পুরাবৃত্ত উদ্ধারিয়া নূতনকে চিনিবার আছে কি উপায় ?—
অকৃত্রিম বন্ধু কিম্বা বিশ্বাসঘাতক, চেনা তা কি যায় ?—

যাকগে যাক। এখন উপস্থিত মত কাজ করতে হবে। রাজা চিত্রবর্ণ মলয় পাহাড়ে শিবির সন্নিবেশ করেছেন। এখন কি করা উচিত ?'

মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, যে চরটি এসেছে তার মুখে শুনলাম, চিত্রবর্ণ তাঁর মহামন্ত্রীর উপদেশ অবহেলা করেছেন। সুতরাং ঐ মূঢ়কে জয় করা সম্ভব। শাস্ত্রে বলেছে—

শত্রু যদি লোভী হয়, হয় ক্রূরমতি
অলস সে হয় যদি, হয় মিথ্যাবাদী,
অস্থির ও ভীরু হয়, হয় সে প্রমাদী,
অবজ্ঞা প্রকাশ করে সেনাদের প্রতি,
সে-শত্রু উচ্ছেদ্য বটে সহজেই অতি।—

সুতরাং শত্রু এসে যতক্ষণ না আমাদের দুর্গ অবরোধ করছে ততক্ষণ নদীতে পর্বতে, বনে, পথে—সর্বত্র তার সৈন্যদের বধ করার জন্য সারস প্রভৃতিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক। শাস্ত্র বলছেন—

শত্রু সৈন্য যদি
গিরিতে নদীতে বনে হয় রুদ্ধগতি,
দীর্ঘপথ অতিবাহি পরিশ্রান্ত অতি,
ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে হয় দুর্বল জর্জর,
অগ্নিভয়ে ভীত হয় তৃষ্ণায় কাতর,
ভোজনেতে ব্যগ্র কিম্বা মত্ত সুরাপানে,
অবিন্যস্ত হয়ে থাকে যেখানে সেখানে,
সংখ্যাল্প হয়, ত্রস্ত বৃষ্টিতে ঝঞ্ঝায়,
আচ্ছন্ন হইয়া থাকে কর্দমে ধূলায়,
দস্যুদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত রয়,
তাহাদের বধ রাজা করিবে নিশ্চয়।—

শাস্ত্রে এ কথাটাও বলা হয়েছে—

আক্রমণ ভয়-হেতু শত্রু-সৈন্য যদি
রাত্রি-জাগরণে থাকে পরিক্লান্ত অতি,
দিবসে ঘুমায়, হয় নিদ্রায় কাতর,
বিজ্ঞ রাজা তাহাদের বধেন সত্বর।—

সুতরাং, মন্ত্রীর কথায় যিনি কান দেন নাই সেই প্রমাদী রাজার সৈন্যগণকে আমাদের সেনাপতিরা সুযোগমত দিবারাত্র হত্যা করতে থাকুক।' তাই করা হল। চিত্রবর্ণের সৈনিক ও সেনাপতিরা অনেকেই নিহত হল। চিত্রবর্ণ তখন দুঃখিত হয়ে নিজের দূরদর্শী মন্ত্রীকে বললেন, 'তাত, আপনি আমাদের প্রতি এরূপ উদাসীন হয়ে রয়েছেন কেন? আমাদের কোথাও কিছু অবিনয় হয়েছে কি? কথায় বলে—

রাজ্য যেন অধিগত, অনুচিত হেন ভাব করা।
অবিনয় সম্পদ বিনাশে, কমরূপে যথা নাশে জরা।—

একথা তো মিথ্যা নয় যে—

দক্ষ যে, সম্পদ সে পায়;
স্বাস্থ্য লভে সুপথ্য যে খায়,
সুখ পায় যে জন অরোগী,
সর্ব বিদ্যা লভেন উদ্যোগী,
সুবিনীত যাঁর আচরণ
তিনি পান ধর্ম, কীর্তি, ধন।'—

গৃধ্র বলল, 'মহারাজ, শুনুন—

বিদ্যা তাঁর নাও থাকে যদি,
তাতে তাঁর কিবা যায় আসে?
বিজ্ঞ-সাহচর্য লভি
শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই
সহজেই লভেন নৃপতি,
তরু যথা সরসী-সকাশে।

শাস্ত্রমতে—

মদ্যপান, ব্যভিচার, দ্যূতক্রীড়া প্রকৃতি শোষণ,
পারুষ্য দণ্ডে ও বাক্যে—রাজাদের এগুলি ব্যসন।

নীতিশাস্ত্রের মতে—

শৌর্যপ্রদর্শনে যার দৃঢ় অনুরাগ,
মনে কিন্তু খোঁচা দেয় গৃহীত উপায়,
মহতী বিভূতি-লাভ তার কর্ম নয়।
নীতিযুক্ত শৌর্যে তাহা লাভ করা যায়।—

আপনি আপনার সৈন্যদের উৎসাহ দেখে কেবল সাহস অবলম্বন করেই আমার মন্ত্রণা উপেক্ষা করেছেন, বাক্যে রূঢ়তা প্রকাশ করেছেন। সেই দুর্নীতির ফল এখন অনুভব করতে হচ্ছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

কুমন্ত্রীর নীতিদোষ কোথা নাহি থাকে?
কে সে কুপথ্য ভোজী ভোগে না অসুখ?
সম্পদে কে দর্পী নয়? মৃত্যু ছাড়ে কা'কে?
স্ত্রী-গত বিষয় কারে দেয় নাকো দুখ?—

জানেন তো—

দুঃখ এলে হর্ষ যায়; শরৎ শেষে শীতটা আসে।
আঁধার বধি সূর্য ভায়; কৃতঘ্নতা পুণ্যে নাশে।
ইষ্টজন-সঙ্গ হলেই সকলই শোক যায় যে চলে;
ধরলে নীতি আপদ যায়; দুর্নীতিতে শ্রী পালায়।—

তাই আমি মনে-মনে ভাবলাম, এই রাজা প্রজ্ঞাহীন, নইলে ইনি নীতিশাস্ত্রের উপদেশ-কৌমুদীকে ক্রুদ্ধবচনের অগ্নিশিখা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন কেন?

নাইকো যাহার বুদ্ধি নিজের, শাস্ত্র তাহার করবে ছাই!
দর্পণে তার লাভটা কিসের চক্ষু যাহার মোটেই নাই।—

এই জন্যই আমি মৌন ছিলাম।'

রাজা তখন জোড়হাত করে বললেন, 'তাত, এটা আমার অপরাধ

হয়েছে। এখন আপনি বলুন, কী ভাবে আমি অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে বিন্ধ্যাচল ফিরে যেতে পারি।' গৃধ্র স্বগত চিন্তা করল—এর একটা প্রতিকার কর্তব্য। কারণ—

দেবতা গরু ও গুরু এবং বিপ্রের,
অথবা বালক বৃদ্ধ তথা আতুরের
উপরে কখনো যদি ক্রোধ উপজয়
অচিরে তা সংবরণ করিবে নিশ্চয়।

সে হেসে বলল, 'মহারাজ, ভয় নাই, আশ্বস্ত হোন। শুনুন—

প্রজামধ্যে ভেদ হলে মন্ত্রী পুনঃ করেন যোজন ;
সান্নিপাতিক হলে সারাতে তা বৈদ্য প্রয়োজন ;
কাজ দিয়ে জ্ঞানবুদ্ধি ঠিকমত পরীক্ষিত হয় ;
সঙ্কট যাবৎ কিছু নাই, সুপণ্ডিত কোন্‌জন নয় ?—

এ শ্লোকটা খুবই সত্য—

তুচ্ছ কাজে হাত দিয়া অজ্ঞেরা অধীর ;
বৃহৎ কর্মেও বিজ্ঞে রহেন সুস্থির।

মহারাজ, আপনার প্রতাপ দিয়েই ওদের দুর্গ ভেদ করে আমি আপনাকে কীর্তিপ্রতাপ-সহই অচিরে বিন্ধ্য-পর্বতে নিয়ে যাব। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন আমাদের সৈন্য কম, কি ভাবে তা হতে পারবে ?' গৃধ্র বলল, 'মহারাজ, সবই হবে। যারা জয় করতে চায়, ক্ষিপ্রকারিতা তাদের জয়লাভের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ ; সুতরাং আজই সহসা গিয়ে ওদের দুর্গ অবরোধ করা যাক।'

গুপ্তচর বক এসে হিরণ্যগর্ভকে সংবাদ দিল, 'মহারাজ, ওদের রাজা চিত্রবর্ণের সৈন্যশক্তি অল্প। মন্ত্রী গৃধ্রের উপদেশ অনুসারে তিনি আমাদের দুর্গের দ্বার অবরোধ করতে আসছেন।'

রাজহংস জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে সর্বজ্ঞ, এখন কী করতে হবে ?'

চক্রবাক উত্তর করল, 'আপনার সৈন্যদের মধ্যে কারা উৎকৃষ্ট আর কারা অপকৃষ্ট বিচার করা হোক। সেটা জানা হয়ে গেলে, সৈন্যদের

মধ্যে রাজ-অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ যথাযোগ্য সুবর্ণ বস্ত্র ইত্যাদি বিতরণ করা হোক।

শাস্ত্রে আছে—

একটি পাইও যদি গড়াইয়া যায়
যেন তা হাজার টাকা, তুলে নেন তায়,
সময়ে, আপত্তি কিন্তু নাই কোটি দিতে—
হেন রাজসিংহে লক্ষ্মী পারে কি ছাড়িতে?—

যজ্ঞে, বিবাহে কিম্বা বিপদের কালে,
শত্রুক্ষয়ে, যশোকর্মে, মিত্রাদি সংগ্রহে,
প্রেয়সী বা ধনহীন স্বজনের তরে—
অষ্টক্ষেত্রে ব্যয় কভু অতিরিক্ত নহে।—

কারণ,—

সামান্য ব্যয়ের ত্রাসে সর্বনাশ করে মূর্খজন,
শুল্ক বেশী ব'লে বিজ্ঞ ছেড়ে কভু যান মূলধন?'—

রাজা বললেন, 'সময় বিশেষে অতিব্যয় করা উচিত বলছেন, সে আবার কেমন কথা? লোকে তো বলে—'বিপদ-সময় লাগি বাঁচাইবে ধন।'

মন্ত্রী বলল, 'কমলা রহিলে ঘরে বিপদ কোথায়?'

রাজা উত্তর করলেন, 'কুপিতা কি কখনও হন না কমলা?'

মন্ত্রী বলল, 'তখন তো সঞ্চিতও নষ্ট হয়ে যায়।—সুতরাং মহারাজ, কার্পণ্য ত্যাগ করে আপনার বিক্রমী সৈন্যদের দান ও মান দিয়ে পুরস্কৃত করুন।"

শাস্ত্রে বলেছে,—

চেনে যারা পরস্পরে হৃষ্ট যাদের মন,
প্রভুর হিতে জীবন দিতে করল যারা পণ,
উচ্চকুলে জন্ম পেল রাজার সমাদর,
পূর্ণ বিজয় পায়ই তারা শত্রুসৈন্য 'পর।

সত্যই— সুস্বভাব, সুসংহত, সংকল্পেতে স্থির,
অরাতি-বাহিনী নাশে পঞ্চশত বীর।—
পাঁচশ বীরেই ভাঙ্গে শক্তি অরাতির।—

মহারাজ মনে রাখবেন—

দোষগুণ-বোধহীন উদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ নরে
শিষ্টেরাও ছাড়ে। অন্যে কে বা স'বে স্বার্থপরে ?
সত্যনিষ্ঠা, শৌর্য, ত্যাগ—এই গুণত্রয়
যে-রাজায় নাই, তিনি নিন্দিত নিশ্চয়।

সুতরাং রাজকর্মচারীদের অবশ্যই পুরস্কার দেওয়া উচিত। কেন না—

যার সাথে সম্বন্ধ-বন্ধন তারি সাথে উত্থান-পতন ;
বিশ্বাসের পাত্রই তো সে রক্ষিবারে ধন ও জীবন।—

কারণ— ধূর্ত নারী কিম্বা শিশু যে-রাজার মন্ত্রদাতা হয়,
অনীতি-তাড়িত তিনি অকাজেতে ডোবেন নিশ্চয়।—
হর্ষ ক্রোধ সুসংযত হল যে-রাজার,
শাস্ত্র-অর্থে যে-রাজার রয়েছে প্রত্যয়,
ভৃত্যদের সুখে-দুখে লক্ষ আছে যাঁর,
রাজ্য তাঁর ধনধান্যে পূর্ণ সদা রয়।—
রাজার উন্নতি হলে উন্নতি যাদের,
অবনতি হলে অবনতি—
অবমান কখনও হেন মন্ত্রীদের
করেন না বিজ্ঞ নরপতি।

কারণ— ডুবিতে বসিলে রাজা অকার্য-সাগরে গর্ব-বশে তাঁর
শিষ্টেরা বাড়ান হাত তীরদেশ হতে করিতে উদ্ধার।'—

এমন সময়, মেঘবর্ণ এসে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, অনুগ্রহ করে এদিকে দেখুন। শত্রুপক্ষ যুদ্ধার্থী হয়ে আমাদের দুর্গদ্বারে এসে পড়েছে। মহারাজের আজ্ঞা পেলে আমি বেরিয়ে গিয়ে নিজের বিক্রম দেখাই। তাহলে মহারাজের নিকট আমার যে ঋণ তার পরিশোধ হয়।'

চক্রবাক বলল, 'উহুঁ, তা হয় না। বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করব, তাহলে দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? শাস্ত্রে আছে—

কুম্ভীর অবশ হয় জল হতে হইলে নির্গত,
বনের বাহিরে সিংহ শূর নয়—শৃগালের মত।'—

কাক বলল, 'মহারাজ, আপনি নিজে গিয়ে যুদ্ধ দেখুন,—

সৈন্যে আগায়ে দিয়া দেখিয়াই লড়ান রাজায়।।
নিকটে থাকিলে প্রভু, কুক্কুরও সিংহ হয়ে যায়।'—

তা'রা সকলেই দুর্গদ্বারে গিয়ে মহা কলরব করতে লাগল। পরদিন রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে বললেন, 'আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখন তা সম্পাদন করুন।

গৃধ্র বলল, 'মহারাজ, তবে শুনুন—

মোটেই কঠিন নহে সে দুর্গ-বিজয়
দীর্ঘ অবরোধ যাহা সহিবার নয়,
একান্ত ক্ষুদ্র যাহা, যার সেনাপতি
নেশায় মাতিয়া থাকে—অনভিজ্ঞ অতি,
রক্ষার ব্যবস্থা যার যথোচিত নয়,
অল্পেতেই যোদ্ধৃবৃন্দ পায় যার ভয়।—

এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়,—

দীর্ঘকাল অবরোধ, শত্রুমধ্যে ভেদ সংঘটন,
সুতীব্র পৌরুষ আর অকস্মাৎ তূর্ণআক্রমণ—
এ উপায়-চতুষ্টয়ে হতে পারে দুর্গের লঙ্ঘন।—

উপস্থিত ক্ষেত্রে যথাশক্তি চেষ্টা করা দরকার।'

চিত্রবর্ণ বললেন, 'তা ঠিক।'

তারপর সূর্যোদয় হবার আগেই, চারটি দুর্গদ্বারেই যুদ্ধ আরম্ভ হলে, মেঘবর্ণ ও তার-অনুচর কাকেরা দুর্গের ভিতরে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। 'দুর্গ নিয়ে নিয়েছে রে, দুর্গ নিয়ে নিয়েছে রে'—এই কোলাহল শুনে, আর স্বচক্ষে বহু গৃহে আগুন জ্বলতে দেখে রাজহংসের দুর্গবাসী সৈন্যদের অনেকেই তাড়াতাড়ি গিয়ে হ্রদে পড়ল।

শাস্ত্রে আছে—

যুদ্ধকালে সমুচিত মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণ,
সমর-ক্ষেত্রেতে নামি যথাসাধ্য শক্তি-প্রদর্শন,
পরাজয় স্পষ্ট হলে অবিলম্ব তূর্ণ পলায়ন।—

তাঁর সুখি স্বভাবের দরুণ, রাজহংস সারসকে সঙ্গে নিয়ে বেশ মন্থর গতিতে যাচ্ছিলেন; চিত্রবর্ণের সেনাপতি কুক্কুট এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল।

হিরণ্যগর্ভ সারসকে বললেন, 'সেনাপতি সারস, আমার অনুরোধে নিজেকে নষ্ট করবে কেন? আমি এখন চলতে পারছি না। তুমি এখনও পালাতে পার; যাও, জলে প্রবেশ করে নিজেকে বাঁচাও। সর্বজ্ঞের অনুমতি নিয়ে, আমার পুত্র চূড়ামণিকে তোমাদের রাজা কোরো।'

সারস বলল, 'মহারাজ, এ রকম দুঃসহ কথা বলবেন না। যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে ততদিন আপনার জয় হোক। মহারাজ, আমি যখন আপনার দুর্গরক্ষী, তখন শত্রু আমারই রক্তমাংসে বিলিপ্ত দ্বারপথ দিয়ে এ দুর্গে প্রবেশ করুক। তাছাড়া—

ক্ষমাবান্ দানশীল গুণগ্রাহী প্রভু ভাগ্যে লাভ হয়।'

রাজা বললেন, 'তা বটে, তবে—

সুস্বভাব সুনিপুণ সুভক্ত ভৃত্যও দুর্লভ নিশ্চয়।'

সারস বলল 'মহারাজ, শুনুন—

সমর ত্যজিলে যদি না হত মরণ,
উচিত হইত বটে সোজা পলায়ন।
অনিবার্য প্রাণীদের মৃত্যুই যখন,
যশে কেন অনর্থক কলঙ্ক-লেপন?—

আর এক কথা—

বায়ু-ক্ষুব্ধ বীচি হেন ভঙ্গুর এ ভবে
পরার্থে জীবন-দান পুণ্যেই সম্ভবে।—

আপনি, মহারাজ, আমাদের প্রভু; সুতরাং সর্বভাবেই আমার

রক্ষণীয়। কারণ—

রাজা, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, রাজার ভাণ্ডার,
সৈন্যদল, মিত্ররাজা, পৌরশ্রেণী আর—
এই আট অঙ্গ নিয়ে রাজ্যের আকার।

রাজা ছাড়া বাকীগুলি, সমৃদ্ধ হলেও বাঁচে নাকো আর।
ধন্বন্তরী বৈদ্য তার কী করিতে পারে আয়ু গেছে যার ?—

সূর্যের উদয়ে খোলে পদ্মের নয়ন,
অস্ত গেলে যায় তা মুদিয়া।
রাজার উত্থানে উঠে তাঁর প্রজাগণ,
পতনেতে পড়ে মুষড়িয়া।—

দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের প্রধান অঙ্গটাই হচ্ছেন রাজা।'

তারপর কুক্কুট এসে রাজহংসের দেহে দারুণ নখরাঘাত করল। সারস সত্বর এসে রাজাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল ; কুক্কুট তাকে নখ মুখ দিয়ে আঘাত করে জর্জর করে ফেলল। সেনাপতি সারস নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রাজাকে জলের মধ্যে ঠেলে দিল ; তারপর সে গিয়ে কুক্কুটের উপর পড়ল। সে তার চঞ্চুদ্বারা কুক্কুটের পেট ফুটো করে দিয়ে তা'কে মেরে ফেলল। তারপর অনেকগুলি পাখী একজোট হয়ে সারসকে আক্রমণ করলে সারসও নিহত হল। চিত্রবর্ণ দুর্গে প্রবেশ ক'রে দুর্গের জিনিষপত্র লুট করিয়ে বন্দীদের মুখে জয়গান-শ্রবণে আনন্দিত হয়ে নিজের স্কন্ধাবারে ফিরে গেলেন।'

রাজপুত্রেরা বললেন—'ঐ রাজহংসের সৈন্যমধ্যে সারসই পুণ্যবান, কারণ নিজের দেহ দিয়ে সে তার প্রভুকে রক্ষা করেছিল।

গরুর বাচ্ছারা সবই পায় বটে গরুর আকার,
শিঙে যার কাঁধ বেঁধে, ক'টি হয় হেন মহাষাঁড় ?'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'হাঁ, সে বিদ্যাধরী-বেষ্টিত হয়ে, মহাবল হয়ে, তার শৌর্যমূল্যে ক্রীত অক্ষয়লোক ভোগ করুক।
শাস্ত্রে বলে—

বীর যারা, প্রভু-হিত তরে প্রাণ দেয় সম্মুখ সমরে ;
ভর্তৃভক্ত কৃতজ্ঞ তাহারা নিশ্চিতই স্বর্গ-লাভ করে।—

একথাও শাস্ত্রেরই—

তা সে যেখানেই হোক,
পড়ি শত্রুর করে
মরে না যে ডরে,
অসীম সাহস ভরে
যুদ্ধ যে করে,
মৃত্যুরে বরে,
যত অক্ষয়-লোক
সে-বীরের তরে।—

বিগ্রহের কথা শুনলে তো তোমরা ?'

রাজকুমাররা বললেন, 'শুনে সুখী হলাম।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'তাহলে তোমাদের এই আশীর্বাদ করি—

রাজা হয়ে তোমাদের
যুঝিতে না হয় যেন
হাতী ঘোড়া পদাতির দ্বারা
সুনীতির কৌশলেই
হেরে যাক শত্রু যত,
গিরি-গর্তে লুকাক গে তা'রা।—

পুনরায় কথারম্ভ হলে রাজপুত্রেরা বললেন, 'আর্য, যুদ্ধের সম্বন্ধে তো শুনলাম, এখন সন্ধির কথা বলুন।' বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'শোনো, সন্ধির কথাও বলছি। তার আদ্য শ্লোক হল এই—

মহাযুদ্ধ হয়ে গেলে রাজায় রাজায়,
— দুজনেরি তাহে বহু সৈন্য মারা যায়,—
মধ্যস্থতা করে আসি গৃধ্র-চক্রবাক ;
স্বল্পকালে সন্ধি হল তাদের কথায়।—

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবে হল ?'

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—

'তারপর, রাজহংস জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের দুর্গে অগ্নি-নিক্ষেপ করল কে ? শত্রুই নিক্ষেপ করল, না, আমাদেরই দুর্গবাসী শত্রু-নিযুক্ত কেউ ?'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, আপনার নিষ্কারণ বন্ধু সেই কাক মেঘবর্ণকে সপরিবারে এখানে দেখা যাচ্ছে না, তাই মনে হচ্ছে, এ দুষ্কর্মটি তারই।'

রাজা একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তাই হবে, এ আমার দুর্ভাগ্য, লোকে ঠিকই বলে—

দেবতার অপরাধ, মন্ত্রীদের দোষ এ তো নয়।
যত্নে সুসাধিত কাজ দৈবযোগে তাই নষ্ট হয়।'

মন্ত্রী বলল, 'না। শাস্ত্রে বলেছে—

পাইয়া বিষম দশা, দৈব 'পরে রোষ!
মূর্খে বোঝে না তাহা নিজ কর্মদোষ।

মহারাজ, ভুলবেন না—

যে না শোনে হিতকাম বন্ধুর বচন,
মন্দমতি, ভাগ্যে তার রয়েছে মরণ;
কাষ্ঠ হতে স্খলিত সে কূর্মের মতন।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?' মন্ত্রী গল্প করলেন—

কচ্ছপ ও হংসদ্বয়ের গল্প

মগধদেশে ফুল্ল-উৎপল ব'লে একটা সরোবর ছিল। সেখানে সঙ্কট আর বিকট নামে দুটি হংস থাকত। তাদের বন্ধু—কম্বুগ্রীব নামে এক কচ্ছপও সেখানে বাস করত। একদিন কয়েকজন ধীবর সেখানে এসে বলাবলি করল, 'আজ আমরা এখানে থেকে কাল সকালে উঠে মাছ-কাছিম প্রভৃতি মারব।' তা শুনে, কচ্ছপ হংসদের ডেকে বলল, 'বন্ধুরা, শুনলে এই ধীবরদের আলাপ? এখন আমি কী করি?' হংসরা বলল, 'ভালো করে ব্যাপারটা বোঝাই যাক, তারপর যা উচিত করা হবে।' কচ্ছপ বলল, 'তা হয় না। আমি যে বিপদ প্রত্যক্ষ করছি। শাস্ত্রে বলে—

বিপদে পড়ার আগে বাঁচিবার ব্যবস্থা যে করে,
বিপদে বাঁচার মত উপস্থিতবুদ্ধি যেবা ধরে,
কুশলেই থাকে তা'রা। শুধু সেই অভাগাই মরে
নির্ভর যে করে রয় একমাত্র দৈবের উপরে।'

হাঁসদুটি জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম?'

কচ্ছপ গল্প সুরু করল—

তিন মৎস্যের গল্প

পূর্বকালে, এই সরোবরেই এমনি ভাবে ধীবররা এসে পড়লে, তিন মাছের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই মাছ তিনটির মধ্যে একজনের নাম ছিল অনাগতবিধাতা। সে বলল, 'আমি তাহলে অন্য জলাশয়ে চললাম' ; এই বলে সে অন্য হ্রদে চলে গেল।

আর-এক মাছের নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতি। সে বলল, 'যা হবে কি না ঠিক নাই, তার জন্য যাব কোথায় ? কিছু করার সময় হলে যথোচিত ব্যবস্থা করা যাবে।'

তৃতীয় মাছটির নাম ছিল যদ্‌ভবিষ্য। সে বলল,—

হবার যা নয় হবে না তা, হবার হলে, হবে—
চিন্তা-বিষের ওষুধ এটা, খাই না কেন তবে ?'

পরদিন সকালে যখন সত্যই ধরা পড়তে হল, প্রত্যুৎপন্নমতি নিজেকে মড়ার মত দেখিয়ে পড়ে থাকল ; ধীবররা তাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে ফেলে দিল ; সেও অমনি ডাঙা থেকে লাফিয়ে গভীর জলে গিয়ে পড়ল। ধীবররা যদ্‌ভবিষ্যকে হাতে পেয়ে মেরে ফেলল।

এই জন্যই বলছিলাম—

বিপদে পড়ার আগে বাঁচিবার ব্যবস্থা যে করে ;
বিপদে বাঁচবার মত উপস্থিত বুদ্ধি যেবা ধরে,
কুশলেই থাকে তা'রা। শুধু সেই অভাগাই মরে
নির্ভর যে করে রয় একমাত্র দৈবের উপরে।

সুতরাং আমি যাতে অন্য জলাশয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা আজই করা হোক্।' হংসরা বলল, 'অন্য জলাশয়ে গিয়ে পড়লে তোমার মঙ্গল বটে, কিন্তু মাটির উপর দিয়ে চলবার উপায়টা কী হবে ?' কচ্ছপ বলল, 'আমি যাতে তোমাদের দুজনের সঙ্গে আকাশপথে যেতে

পারি, তার ব্যবস্থা করো।' হংসরা বলল, 'কী ভাবে তা সম্ভব?' কচ্ছপ বলল, 'তোমারা দুজন চঞ্চু দিয়ে একখণ্ড কাঠ ধরে থাকবে, আমি মুখে করে সেটা আঁকড়ে থাকব, এই ভাবে, তোমাদের পাখার জোরে আমিও সুখে চলে যাব।' হংসরা বলল, 'এই উপায়টা সম্ভব বটে। কিন্তু—

উপায় ভাবিতে বসে প্রাজ্ঞজনে ভেবে নেন
যত কিছু বিপদ তাহার
চোখের সমুখে তারই বকের সন্তানে যত
নকুলেরা করিল আহার।'

কচ্ছপ জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম?'

হংসরা গল্প বলল—

বক সর্প ও নকুলের গল্প

উত্তরাপথে গৃধ্রকূট নামে এক পর্বত আছে। সেখানে রেবা নদীর ধারে এক বটগাছে বহু বক বাস করত। সেই গাছের তলদেশে এক সাপ থাকত, সে বাচ্ছাগুলোকে খেয়ে যেত। শোকার্ত বকেদের বিলাপ শুনে এক বৃদ্ধ বক বলল, 'ওহে, তোমরা এক কাজ করো। কিছু মাছ এনে বেজীর গর্ত থেকে সাপের গর্ত পর্যন্ত পঙ্‌ক্তিক্রমে একটি একটি করে ছড়িয়ে দাও। সেই সব মাছ খাওয়ার পথে বেজীরা এসে সাপটাকে দেখতে পাবে, আর দেখলেই স্বভাব-বিদ্বেষে তাকে মেরে ফেলবে।' বকরা তাই করল, ঘটলও তাই। তবে, বেজীগুলো গাছের উপর পক্ষীশাবকদের কিচির মিচির শুনতে পেয়ে গাছে উঠে বকশাবকদেরও খেয়ে ফেলল।

তাই বলছিলাম—

উপায় ভাবিতে বসে প্রাজ্ঞজনে ভেবে নেন
যত কিছু বিপদ তাহার
তারই চোখের পরে বকের সন্তান যত
নকুলেরা করিল আহার।

আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি দেখে লোকে কিছু বলবে, তা শুনে তুমি যদি উত্তর দিতে যাও, তাহলেই মারা পড়বে। কাজেই, তোমার পক্ষে এখানে থেকে যাওয়াই সব দিক দিয়ে ভালো।'

কচ্ছপ বলল, 'এতই বোকা আমি? 'আমি কোনো উত্তরই দেব না, কিছুই বলব না।'

তারপর কচ্ছপকে আকাশে ঐ ভাবে নীয়মান দেখে রাখালরা পিছু ধরল, বলতে লাগল, 'ওরে বড় আশ্চর্য ব্যাপার। দুটো পাখী একটা কাছিমকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!'

একজন বলল, 'এই কাছিমটা যদি পড়ে যায় তো এখানেই ওটাকে পাক করে খাওয়া যাবে।' কেউ বলল, 'বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।' কেউ বলল, 'পুকুরের ধারে রেঁধে খেতে হবে।' তাদের সেই সব পরুষ বচন শুনে কচ্ছপ ক্রুদ্ধ হল, ক্রোধের বশে তার ভুল হয়ে গেল। সে বলতে গেল, 'তোরা ছাই খাবি!'—এই বলতে না বলতে সে কাষ্ঠখণ্ড থেকে পড়ে গেল। রাখালরা তাকে মেরে ফেলল।

এই জন্যই বলছিলাম—

যে না শোনে হিতকাম বন্ধুর বচন।
মন্দমতি, ভাগ্যে তার রয়েছে মরণ।'

গুপ্তচর বক সেখানে এসে বলল, 'মহারাজ, আমি আগেই তো বলেছিলাম যে, প্রতিক্ষণেই দুর্গ-শোধন করা উচিত। তা আপনারা করেন নাই। সেই অনবধানের ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে। দুর্গ

পোড়ানোটাও ঐ কাক মেঘবর্ণের কাজ; গৃধ্র তাকে নিয়োগ করেছিল।' রাজা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—

'প্রণয়ের বশে কিম্বা উপকার পেয়ে
শত্রুজনে যে করে প্রত্যয়,

বৃক্ষ-অগ্রে নিদ্রাগত মূর্খের মতন
পড়ি' তবে জ্ঞান তার হয়।'

চর বক বলল, 'মেঘবর্ণ যখন দুর্গ দাহ করে এখান হতে গেল তখন চিত্রবর্ণ খুশী হয়ে বললেন, এই মেঘবর্ণকে কর্পূরদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করা যাক। কেন না,—

ভৃত্য যদি কৃত্য তার সম্পাদন করে
প্রভু যেন মানি লন সেই উপকার,
যথাযোগ্য অনুগ্রহ সে ভৃত্যের 'পরে
ফোটে যেন দৃষ্টি-বাক্য-দানেতে তাঁহার।'

চক্রবাক বলল, 'মহারাজ, চর কী বলল, শুনছেন তো ?'

রাজা বললেন, 'হাঁ, শুনছি,—তারপর ?'

চর বলে চলল, 'প্রধান মন্ত্রী গৃধ্র তখন বলল, 'মহারাজ, সেটা উচিত হবে না, একে অন্য কোনো ভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। কেন না—

যে কাজে নিযুক্ত যেবা করণীয় সে কাজ তাহার।
বালুকায় দাগ-কাটা শুধু নীচ জনে করা উপকার।

মহতের পদে নীচকে নিয়োগ কখনও কর্তব্য নয়। শাস্ত্রে বলেছে—

বড় পদ পেলে নীচ প্রভু-হত্যা করিতে যে চায় !
মূষিক সে ব্যাঘ্র হয়ে মুনিকেই মারিবারে যায়।'

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?' গৃধ্র গল্প করলেন—

মুনি আর মূষিক শাবকের গল্প

গৌতমারণ্যে মহাতপা বলে এক মুনি ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর আশ্রমের কাছেই কাকের মুখ থেকে পড়ে-যাওয়া এক মূষিকশাবক দেখলেন। দয়াযুক্ত হয়ে তিনি সেটাকে ধান্যকণা খাইয়ে বড় করলেন। একদিন মুনি দেখলেন, একটা বিড়াল তাকে খাওয়ার

জন্য তার পিছনে পিছনে তাড়া করছে। তাই, তপের প্রভাবে তিনি সেই মূষিককে একটা বলিষ্ঠ বিড়াল করে দিলেন। বিড়াল হয়ে সে কুকুরকে ভয় করত ; তাই, তাকে কুকুর করা হল। কুকুরের আবার মস্ত ভয়ের কারণ হল বাঘ ; সেইজন্য, তাকে বাঘ করে দেওয়া হল। সেই বাঘকে মুনি মূষিক বলেই মনে করতেন। এই কারণে, সেখানকার সমস্ত লোকেই সেই বাঘকে দেখে বলাবলি করত, 'এই মূষিকটাকে মুনি বাঘে পরিণত করেছেন।' তা শুনে, সেই বাঘের মনে দুঃখ হত। সে ভাবত, 'এই মুনি যতদিন বাঁচবে, ততদিন আমার এই কলঙ্ককর স্বরূপের আখ্যান ঘুচবে না।' এই না ভেবে, সে মুনিকে বধ করতে উদ্যত হল। মুনি তার এই মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বুঝে, 'আবার মূষিক হয়ে যা' এই বলে তাকে আবার মূষিক করে দিলেন।

এই জন্যই বলছিলাম—'বড় পদ পেলে নীচ, প্রভু-হত্যা করিতে সে চায়।' তা ছাড়া, মহারাজ, এটা যে সুকর, এমনও মনে হয় না। শুনুন—

ভালো-মন্দ মৎস্য খেয়ে, মূর্খ বক শেষে
কর্কট ধরিতে গিয়া গেল যম-দেশে।'

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?'

মন্ত্রী বলল,—

বৃদ্ধ বক মৎস্য ও কর্কটের গল্প

মালবদেশে পদ্মগর্ভ বলে এক সরোবর আছে। সেখানে এক সক্ষম বৃদ্ধ বক, নিজেকে উদ্বিগ্নের মত দেখিয়ে, দাঁড়িয়ে ছিল। এক কাঁকড়া তাকে দূর থেকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ? আপনি আহার ত্যাগ করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?' বক বলল, 'আমি

মাছ খেয়ে বাঁচি। আমি নগরপ্রান্তে কৈবর্তদের আলাপ শুনে এলাম, তা'রা এখানে এসে নিশ্চয়ই মাছ মারবে। সুতরাং, এখানে আমাদের না-খেয়ে মরার সময় এসে গিয়েছে জেনে আহারেও আমার আর রুচি হচ্ছে না। তা শুনে, সমস্ত মাছ মিলে আলোচনা করল, এখন অন্ততঃ একে আমাদের উপকারক বলে দেখা যাচ্ছে, সুতরাং কী করা যাবে সেটা একেই জিজ্ঞাসা করা যাক। শাস্ত্রে বলেছে—

শত্রু যদি উপকারী হয়, তার সাথে সন্ধি হতে পারে ;
মিত্র যদি হয় অপকারী, বর্জনই করিতে হয় তারে।
উপকারী কিম্বা অপকারী এই মাত্র দেখিয়া নিশ্চয়,
কেবা শত্রু, মিত্র কোনজন করা যায় সঠিক নির্ণয়।'

এই রকম আলোচনা করে মাছেরা বলল, 'ওহে বক, এখন আমাদের বাঁচবার উপায় কী, বল দেখি।' বক বলল, অন্য জলাশয়ে গেলেই বাঁচবার উপায় হয়। সেখানে আমিই তোমাদের নিয়ে যাব, একজন করে কিন্তু।' মাছরা বড়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তা'রা বলল, 'তাই হোক।' দুষ্ট বক তাদের একজন করে নিয়ে যেত, এক জায়গায় এসে খেত, আর ফিরে গিয়ে বলত, 'ওদের আমি অন্য জলাশয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম।' বক এর আগে কাঁকড়ার মাংস খায় নাই, তাই তার মাংস খাওয়ার লোভে একদিন তাকে খুব আদর করে ডাঙ্গার উপর দিয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে কাঁকড়া দেখল, ভূমিটা মাছের কাঁটায় ভরে রয়েছে ; দেখে ভাবল, হায় রে, মারা পড়লাম আমি। ভালো, এখন সময় বুঝে চলতে হচ্ছে। কেন না—

ভয়ের কারণটা'কে ভয়-করা ভালো
যতক্ষণ তাহা অনাগত,
ভয়ের কারণ যদি ঘাড়ে এসে পড়ে
নাশো তারে নির্ভীকের মত।

তা ছাড়া—

আক্রান্ত হইয়া দেখি নিজ অকল্যাণ,
যুঝিতে যুঝিতে প্রাজ্ঞ শত্রু নিয়ে যান।

এই ভেবে কাঁকড়া সেই বকের ঘাড়টা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল, বক মারা গেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

ভালো মন্দ মৎস্য খেয়ে মূর্খ বক শেষে
কর্কট খাওয়ার লোভে গেল যমদেশে।'

রাজা চিত্রবর্ণ পুনরায় বললেন, 'শোনো তবে মহামন্ত্রী, এটা আমি ভেবে চিন্তে ঠিক করেছি যে, এই মেঘবর্ণ এখানে রাজা থেকে এই কর্পূর দ্বীপে যে-সব ভালো ভালো জিনিষ পাওয়া যায় সেগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। সেগুলো পেয়ে আমরা বেশ বিলাসের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে থাকতে পারব।'

দূরদর্শী একটু হেসে বলল—

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—এই দশা যার,
ভাঁড়-ভাঙা বিপ্র হেন লভে তিরস্কার।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কেমন?'

দূরদর্শী গল্প বললেন—

ব্রাহ্মণ ও তার শক্তুভাণ্ডের গল্প

দেবকোট্ট নগরে দেবশর্মা বলে এক ব্রাহ্মণ ছিল। মহাবিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে সে এক ভাঁড় ছাতু পেয়েছিল। রৌদ্রে আকুলিত হয়ে সে সেটা নিয়ে এক কুম্ভকারের মণ্ডপিকায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল। কুম্ভকারের সেই ছোট্ট মণ্ডপটা ছিল ভাণ্ড-পূর্ণ। ছাতু রক্ষা করার জন্যে ব্রাহ্মণ তার হাতে একটি লাঠি নিয়ে ভাবছিল—এই একভাঁড় ছাতু বিক্রি করে আমি যদি দশ কপর্দক পাই তাহলে এখানেই সেই কপর্দক দিয়ে ভাঁড় ছাতু প্রভৃতি কিনি। এইভাবে

ধন বহুগুণ বৃদ্ধি ক'রে তা দিয়ে সুপারি, কাপড় প্রভৃতি কিনে বাণিজ্য করি। তারপর লক্ষ টাকা জমা হলে চারিটি বিবাহ করি। চার স্ত্রীর মধ্যে যেটি রূপ-যৌবনবতী তাকেই বেশী ভালবাসি। তারপর সপত্নীদের মধ্যে যখন ঈর্ষা জন্মাবে, তা'রা পরস্পর দ্বন্দ্ব করবে, তখন আমি কোপাকুল হয়ে এমনি করে সকলকেই লাঠি-পেটা করব—এই ভেবে সে তার হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল। তার ফলে, তার ছাতুর ভাঁড়টা চূর্ণ হয়ে গেল। কুম্ভকারের বহু ভাঁড়ও ভাঙল। ভাঁড় ভাঙার শব্দ পেয়ে কুম্ভকার এসে ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে তার মণ্ডপিকার বাইরে তাড়িয়ে দিল।

এই জন্যই বলছিলাম —

হাতে না পেতেই বস্তু আনন্দ যাহার,
ভাঁড়-ভাঙা বিপ্র হেন লভে তিরস্কার।'

তারপর, মন্ত্রী গৃধ্রকে একান্তে ডেকে নিয়ে রাজা বললেন, 'তাত যা করতে হবে বলুন।'

গৃধ্র বলল—

'যুদ্ধোদ্ধত অশ্ব বা করীর, গর্ব-অন্ধ তথা নৃপতির
নেতা যারা, তাহারা নিশ্চয় সমাজেতে নিন্দাস্পদ হয়।

মহারাজ, শুনুন। দুর্গটা যে ভেঙ্গেছে, সে কি আমাদের পরাক্রমে, না, আপনার প্রতাপ-সাধ্য কৌশলে?'

তার উত্তরে রাজা বললেন, 'আপনার কৌশলে।'

গৃধ্র বলল, 'তাহলে, আমার কথামত যদি চলেন তো বলি, দেশে ফেরা যাক। নইলে সামনে বর্ষা, সমান সমান শক্তির মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধলে—আমরা পরদেশে আছি—আমাদের স্বদেশগমন কষ্টকর হবে। সুতরাং সুখ ও গৌরব বজায় রাখার জন্যে সন্ধিস্থাপন করে

ধর্মেরে যে পুরোভাগে রাখে, মন-রাখা বাক্য নয় যার—
হিত শুধু কয় যে রাজাকে সৎমন্ত্রী সেই তো রাজার।

তাছাড়া—

সমানেরো সাথে সন্ধি চাহিবে নিশ্চয়,
সমরেতে জয় যেথা সন্দেহ-বিষয়।
সে কাজ উচিত নয়, যাহাতে সংশয়,
বলেছেন বৃহস্পতি!—আর কেহ নয়।
মিত্র বল রাজ্য কীর্তি এবং জীবন
যুদ্ধের সংশয়ে ফেলে কোন বিজ্ঞজন?

জানেন তো—

কখনো কখনো যুদ্ধে উভয়েই মরে।
সুন্দ-উপসুন্দ বীর সমান সমান
লড়াই করিতে গিয়া মরে পরস্পরে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

মন্ত্রী গল্প বললেন—

দৈত্য সুন্দ উপসুন্দের গল্প

সুন্দ ও উপসুন্দ ছিল সহোদর। তা'রা ত্রৈলোক্য-রাজ্য-কামনায় মহা কায়ক্লেশে দীর্ঘকাল ভগবান চন্দ্রশেখরের আরাধনা করলে ভগবান তাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমরা বর চাও।' তাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা সরস্বতীর প্রভাবে তা'রা এক বলতে আর এক বলে বসল, 'ভগবান যদি আমাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন তো পরমেশ্বর তাঁর প্রিয়া পার্বতীকে দান করুন।' ভগবান তাতে ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু বর দিতেই হবে বলে পার্বতীকে দান করলেন। তখন ঐ দুই

বলে পরস্পর কলহ করতে লাগল! শেষে তা'রা ঠিক করল, কাউকে মধ্যস্থ মেনে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। এমন সময় মহেশ্বর ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তা'রা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা দুজনেই স্ববলে এঁকে লাভ করেছি। ইনি আমাদের দুজনের মধ্যে কার?'

ব্রাহ্মণ বললেন—

'বিপ্র পূজ্য জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ হলে, ক্ষত্র পূজ্য বলবান বলে,
ধনবান বৈশ্য পূজা পায়, শূদ্র পূজ্য দ্বিজের সেবায়।

তোমরা দুজনেই ক্ষত্রিয়ধর্মী। তোমাদের নিয়মই হচ্ছে যুদ্ধ; যুদ্ধ করে তোমরা এ প্রশ্নের মীমাংসা করো।' একথা বলা হলে, সুন্দ-উপসুন্দ বলল, 'ইনি ঠিক বলেছেন।' সমবীর্য তা'রা, যুগপৎ পরস্পরকে আক্রমণ করে দুজনেই মারা গেল।

এই জন্যই বলছিলাম—

সমানেরো সাথে সন্ধি চাহিবে নিশ্চয়
সমরেতে জয় যেথা সন্দেহ-বিষয়।

রাজা বললেন, 'এ কথা আগে বলেন নাই কেন?'

মন্ত্রী বলল, 'আপনারা আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনেছিলেন তখন? আমার সম্মতি নিয়ে এই যুদ্ধারম্ভ হয় নাই। কেন না আমি জানতাম এই হিরণ্যগর্ভ সাধুগুণযুক্ত, তাঁর সঙ্গে বিগ্রহ অনুচিত। শাস্ত্রে বলেছে—

সত্যবাদী, সদাচার, ধর্মপরায়ণ,
অনার্য, বহু যার আত্মীয়-স্বজন,
অনেক সমর জয়ী, পরাক্রমী তথা—
এ সাতের সাথে সন্ধি উচিত সর্বথা।
শপথ করিয়া রাখে সত্যপরায়ণ,
সন্ধি করি প্রাণপণে করে সে পালন,

প্রাণের সঙ্কটে নাহি করে মিথ্যাচার,
ভাল করি জানে ইহা সমস্ত সংসার—
সে জন আক্রান্ত হলে তার পক্ষ লয়ে
সকলেই যুদ্ধ-করে দ্বিধাহীন হয়ে ;

প্রজা-অনুরাগ আর ধর্মের কারণ,
অতীব দুষ্কর হয় তারে উচ্ছেদন।

সর্বনাশ আসি যদি উপস্থিত হয়
অনার্যেরও সাথে সন্ধি বিধেয় নিশ্চয়।
তাহার আশ্রয় ছাড়া আর্য কদাচন
দম নিতে করে নাকো সময়-হরণ।
ভ্রাতা বন্ধু সহ রাজা রহেন যখন,
— কণ্টক-আবৃত যেন ঘন বেণুবন—
সঙ্ঘবদ্ধতার হেতু সবল তাঁহারে
সমুচ্ছেদ করিবারে, বল, কেবা পারে?
বলী সহ সমরের দৃষ্টান্ত কোথায়?
বায়ু-প্রতিকূলে মেঘ কখনও কি যায়?
জামদগ্ন্য-হেন বহু যুদ্ধবিজেতার
মিত্রতায়, ভোগ হয় নির্বিঘ্ন রাজার।
বহু যুদ্ধ বিজয়ীর সাথে সন্ধি যার
তাঁর প্রতাপেই বশ মানে শত্রু তার।

সুতরাং এক্ষেত্রে এই বহুগুণান্বিত রাজহংসের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত।'

মন্ত্রী চক্রবাক বলল, 'চর মশায়, এ সব তো বুঝলাম। এখন যাও, তারপর কী হল, জেনে এসো।'

তারপর হিরণ্যগর্ভ চক্রবাককে বলল, 'কাদের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত নয় সেটাও জানতে চাই আমি।'

মন্ত্রী চক্রবাক বলল, 'মহারাজ বলছি শুনুন—

শিশু, বৃদ্ধ, চিররোগী, নির্বান্ধব, আর
স্বয়ং যে ভীরু, ভীরু সব সেবকেরা যার,
নিজে লোভী, লোভী যার অনুজীবীগণ,
প্রজারা বিরক্ত যার, ভোগে যার ডুবে আছে মন,
চঞ্চল মন হেতু মন্ত্র যার হয় নাকো স্থির,

দেবতাব্রাহ্মণে যার একান্তই অভাব ভক্তির,—
দৈব যারে বাম, যার দৈবই সম্বল,
অন্নহীন রাজ্য যার, ভগ্ন যার বল,
বিভূঁয়ে পড়েছে যেবা, বহু শত্রু যার,
অসমাপ্ত আয়োজনে সমর যাহার,
সত্য তথা ধর্ম হতে ভ্রষ্ট যে হয়েছে—
এ বিশ রাজার সাথে সন্ধি করা মিছে।
সংগ্রামে এদের সাথে, সন্ধি কভু নয়,
লড়িলেই ক্ষিপ্র এরা মানে পরাজয়।

কেন তাও শুনুন—

শিশুর প্রতাপ কম, তারে লোকে লড়িতে না চায়,
যুদ্ধ-অযুদ্ধ ফল বুঝিবার শক্তি বা কোথায় ?
বৃদ্ধ আর চিররোগী—অসমর্থ, নিরুদ্যম হয় ;
এরা হয় পরাভূত স্বপক্ষের দ্বারাই নিশ্চয়।
সে-আরও সুখোচ্ছেদ্য জ্ঞাতিগণ ছাড়িয়াছে যারে ;
তাদের করিলে হাত, জ্ঞাতিরাই সে-রাজায় মারে।
যুদ্ধ ছাড়ি গিয়া ভীরু সর্বনাশ ডেকে আনে ঘরে।
সেবকেরা ভীরু হলে নৃপে ছাড়ি পলায় সমরে।
লুণ্ঠিত ধনের ভাগ লোভী নাহি দেয় সেনাগণে ;
সেই হেতু তাহারাও তার লাগি লড়ে নাকো রণে।
সেবকেরা লোভী হয়, না পাইলে দান পুরস্কার।
লোভবশে তারা তাই চেয়ে থাকে বিনাশ রাজার।
বিরক্ত প্রজারা যার, অত্যাচারী সে নৃপে সমরে
প্রজারা ছাড়িয়া যায়, একটুও দ্বিধা নাহি করে।
যে নৃপতি ভোগসুখে অতিমাত্র মত্ত হয়ে রয়
সহজেই তার ঘটে রণভূমে ঘোর পরাজয়।
চঞ্চলমতি যার মন্ত্র যার রয় নাকো স্থির,
সে রাজা দ্বেষ্যই হয় আপনার যতেক মন্ত্রীর।

অস্থির দেখিয়া মতি মন্ত্রীগণ এহেন রাজার
মন্ত্রণা-বিষয়ে যত্ন স্বভাবতঃ করে নাকো আর।
ধর্মই সর্বত্র জয়ী, আপনিই নষ্ট তাই যত
দেবতা-দ্বিজের দ্বেষী আর যত দৈব-উপহত।
সম্পদ বা বিপদের একমাত্র দৈবই কারণ
এইরূপ চিন্তা যার, কর্মে তার নাহিকো যতন।
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাজা হয়ে থাকে দুর্বল স্বতঃই।
বলই বিপন্ন যার, যুঝিবার শক্তি তার কই ?
বিভূঁয়ে পড়িলে রাজা, সহজেই মারে শত্রু তারে ;
হাতীও কাতর হয় অতিক্ষুদ্র হাঙরের মারে।
অতি ভয়ে ভয়ে থাকে, চারদিকে শত্রু আছে যার ;
যে দিকে পলাতে যাবে সে দিকেই বিপদ তাহার ;
শ্যেনমধ্যে কপোতের দুর্দশাই হয় সে রাজার।
শত্রুপক্ষ যদি তার নিজ কালে করে আক্রমণ,
অকাল-যোদ্ধার হায় ! হয়ে থাকে নিশ্চয় পতন ;
রাত্রে অন্ধ বায়সেরে মেরে যায় পেচক যেমন।
সত্য-ধর্ম-ভ্রষ্ট সাথে সন্ধি কভু উচিত না হয় ;
অসাধু সে, সন্ধি করি ভাঙিবে তা, থাকে এই ভয়।

আরও বলছি, সন্ধি, বিগ্রহ, যান অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা, আসন অর্থাৎ যুদ্ধের অপেক্ষায় ঘাঁটি তৈয়ারি, সংশ্রয় অর্থাৎ প্রবল শত্রুর আশ্রয় লওয়া, আর দ্বৈধীভাব অর্থাৎ মুখে আত্মসমর্পণ করে কার্যতঃ ঘাঁটি আগলে থাকা—এই ছয়টি হল কর্মারম্ভের উপায়। আর মন্ত্রণাবিষয় হল পঞ্চাঙ্গ ; যথা—যুদ্ধ আরম্ভের উপায়, সৈন্য ও কোষের ব্যবস্থা, দেশ ও কাল নির্বাচন, নানারূপ বাধার প্রতিকার এবং আরব্ধ কার্যের সিদ্ধি। উপায় হচ্ছে চার প্রকারের—সাম অর্থাৎ আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা ; দান অর্থাৎ ধনাদি দিয়ে শত্রুকে খুশী করা ; ভেদ, অর্থাৎ শত্রুপক্ষে ভেদ ঘটিয়ে দেওয়া, আর দণ্ড অর্থাৎ শত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। শক্তি হচ্ছে তিন রকমের—বিক্রমশক্তি, মন্ত্রশক্তি আর প্রভুশক্তি। এই

সমস্ত আলোচনা করেই বিজয়কামী রাজারা বড় হন। কারণ,—

লক্ষ্মী চঞ্চলা বটে, লভ্যা ন'ন প্রাণমূল্য দিয়া ;
নীতিবিদ্-গৃহে কিন্তু যান তিনি সত্বর করিয়া।'

কথিত আছে,—

বিত্ত যার সমভাবে বিভাজিত হয়,
গুপ্ত যার চর, আর গূঢ় মন্ত্র যার,
অপ্রিয় বচন যেবা কারেও না কয়,
বশ মানে আসমুদ্র পৃথিবীটা তার।

কিন্তু মহারাজ, মহামন্ত্রী গৃধ্র সন্ধি করার পরামর্শ দিলেও রাজা নিজের বাহুবলের দর্পে তা স্বীকার করছেন না। সুতরাং এক কাজ করা যাক, আমাদের মিত্ররাজা সিংহলদ্বীপের মহাবল নামক সারস জম্বুদ্বীপে একটা অশান্তি সৃষ্টি করুক। কারণ,—

গোপনেতে নিজ বল সংহত করিয়া
প্রবেশিয়া শত্রুরাজ্যে পরাভূত বীর
শত্রুকেও নিজের মত দিবে তাতাইয়া।
তাহলেই তার হবে প্রবৃত্তি সন্ধির।'

রাজা বললেন, 'তাই হোক।' এই বলে তিনি বিচিত্র নামে এক বককে একটা গুপ্তলেখ দিয়ে সিংহল দ্বীপে পাঠালেন। সেই চর ফিরে এসে বলল, 'মহারাজ, সেখানকার বার্তা শুনুন। সেখানকার গৃধ্র বলল, 'মেঘবর্ণ ওখানে বহুদিন বাস করেছে; সে জানে, রাজা হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত কিনা।' তখন রাজা চিত্রবর্ণ ঐ মেঘবর্ণকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে কাক, ঐ রাজা হিরণ্যগর্ভ কিরূপ ব্যক্তি? তাঁর মন্ত্রী চক্রবাকই বা কি রকম?'

মেঘবর্ণ বলল, 'মহারাজ, রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠিরের মতই মহাশয় ও সত্যবাদী। চক্রবাকের মত মন্ত্রীও কোথাও দেখা যায় না।'

রাজা বললেন, 'তাই যদি হয়, তিনি তোমার দ্বারা প্রবঞ্চিত হলেন কী করে?'

মেঘবর্ণ একটু হেসে বলল—

'বিশ্বাস যে করে তাকে বঞ্চিতে কী নিপুণতা চায়?
কোলেতে যে নিদ্রা যায়, তাকে মেরে পৌরুষ কোথায়?—

মহারাজ, শুনুন। ওদের মন্ত্রীটি আমাকে প্রথম-দর্শনেই চিনে ফেলেছিল। কিন্তু সেই রাজা মহাশয় ব্যক্তি বলেই প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ,—

নিজে সত্যবাদী ব'লে সত্যবাদী ভাবে সে দুষ্টকে;
ছাগবাহী বিপ্রসম সেই ব্যক্তি সহজেই ঠকে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

মেঘবর্ণ গল্প করল—

ব্রাহ্মণ ও তিন ধূর্তের গল্প

গৌতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকত। সে একটা যজ্ঞ আরম্ভ করেছিল। সেই যজ্ঞের জন্য সে গ্রামান্তরে গিয়ে একটা ছাগ কিনে তাকে কাঁধে ফেলে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন দূর থেকে সে তিন ধূর্তের নজরে পড়ল। তা'রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এই পাঁটাটাকে যদি কোনো উপায়ে হাত করতে পারা যায়, তাহলে বুদ্ধির একটা খেল দেখানো হয় বটে।' এই বলে তা'রা এক বড় মাঠের মধ্যে একক্রোশ অন্তরে-অন্তরে তিনটি গাছের তলায় ব্রাহ্মণের আসার প্রতীক্ষায় পথে বসে রইল। ব্রাহ্মণ যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক ধূর্ত তাকে ডাক দিয়ে বলল, 'ও ঠাকুরমশায়, এ কী ব্যাপার, কাঁধে ক'রে কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কেন?' ব্রাহ্মণ বলল, 'আরে, এটা কুকুর নয়, বলির পাঁটা।' এক ক্রোশ দূরে আর-এক ধূর্ত ছিল, সেও ব্রাহ্মণকে ঐ রকম বলল। তা শুনে ব্রাহ্মণ পাঁটাটাকে মাটিতে নামিয়ে বারবার ভালো করে দেখে নিল। তারপর, আবার সেটাকে কাঁধে তুলে মনের মধ্যে একটা ধোঁকা নিয়ে চলতে লাগল। কেন না,—

ধীর লোক—তারও বুদ্ধি খলের বচনে দোল খায়।
বিশ্বাস যে করে তাতে, মরেই সে চিত্রকর্ণ-প্রায়।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

মেঘবর্ণ বলল—

সিংহ, কাক, বাঘ, শৃগাল ও উটের গল্প'

এক বনে মদোৎকট বলে এক সিংহ থাকত। তার তিনজন অনুচর ছিল—কাক, বাঘ আর শৃগাল। একদিন তা'রা বেড়াতে বেড়াতে দলছাড়া এক উটকে দেখতে পেল, তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা হতে আসছেন?' সে নিজের বৃত্তান্ত বলল। তা'রা তাকে নিয়ে গিয়ে সিংহের হাতে সঁপে দিল। সিংহ তাকে অভয়দান ক'রে চিত্রকর্ণ নাম দিয়ে তাকে নিজের কাছে রেখে দিল। এমনি ভাবে দিন কাটছিল। একবার, সিংহের শরীর-বিকলের এবং অতিবৃষ্টির জন্য আহার-সংগ্রহ না হওয়াতে তা'রা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কাক বাঘ আর শৃগাল তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, 'প্রভু যাতে এই চিত্রকর্ণকে মারেন তার ব্যবস্থা করা যাক। এই কাঁটা-খেগোকে নিয়ে আমাদের লাভটা কী?'

বাঘ বলল, 'প্রভু তাকে অভয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, সুতরাং তা কী করে সম্ভব?'

কাক বলল, 'প্রভু এখন ব্যাধি ও ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছেন: এখন তিনি পাপকাজও করবেন। কারণ,—

ক্ষুধার্তা মহিলা ত্যজে সন্তানে আপন।
ভুজগী ক্ষুধার্তা হলে নিজ অণ্ড খায়।
কোন্ পাপ করে নাকো বুভুক্ষিত জন?
নির্মম সকলে হয় উদর-জ্বালায়।

জান তো,—

মাতাল বা প্রমাদী যে, উন্মত্ত যে-জন,
বিপন্ন যে, কুপিত বা ক্ষুধায় বিব্রত,
লোভী যে, যে হঠকারী, ভীরু বা কামুক,
হয়ই সে ধর্মহীন, পাপকর্মে রত।'

এই ঠিক ক'রে তা'রা সিংহের কাছে গেল। সিংহ জিজ্ঞাসা করল,

'আহারের কিছু পেলে ?'

কাক বলল, 'মহারাজ, চেষ্টা করেও কিছু পাওয়া গেল না।'

সিংহ বলল, 'তা হলে এখন বাঁচার উপায় কী ?'

কাক বলল 'মহারাজ, বিনা চেষ্টাতেই যা পাওয়া যায় সে-রকম খাদ্য ত্যাগ করার জন্যই এই সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।'

সিংহ জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে স্বেচ্ছামত নেওয়া যায় এমন খাদ্য কী আছে ?'

কাক সিংহের কানে-কানে বলল, 'চিত্রকর্ণ'। সিংহ মাটি ছুঁয়ে, নিজের কানদুটো ছুঁয়ে বলল, 'আমি ওকে অভয় দিয়েছি, সুতরাং তা কী করে হতে পারে ? শাস্ত্রে বলে—

ভূমিদান কিম্বা স্বর্ণদান, ধেনুদান কিম্বা অন্নদান—
মহাদান নামে খ্যাত অভয়দানের কভু না হয় সমান।'

কাক বলল, 'ওকে মারা আপনার উচিত নয়। তবে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত যাতে ও নিজের দেহদান করতে অঙ্গীকার করে।'

এ কথা শুনে সিংহ চুপ করে রইল। অবকাশ বুঝে, একটা ছল ক'রে, কাক সকলকে সিংহের কাছে নিয়ে এল।

কাক বলল, 'বহু চেষ্টা করেও কোনও আহার পাওয়া গেল না। অনেক উপবাসে প্রভুর দেহ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, তাই বলছি, তিনি ইদানীং আমার মাংসই আহার করুন। কেন না—

রাজা মূল, বাকী-বৃক্ষ প্রকৃতিসকল।
মূলটি বাঁচালে, বৃক্ষে ধরে তবে ফল।'

সিংহ বলল, 'ভদ্র, প্রাণত্যাগও ভালো, তবু এ রকম কাজে প্রবৃত্তি হয় না।' শৃগালও কাকের মত নিজের মাংস দেওয়ার প্রস্তাব করল।

সিংহ বলল, 'না, তা হয় না।'

বাঘও বলল, 'আমার দেহ নিয়ে প্রভু জীবিত থাকুন।'

সিংহ বলল, 'এটা কখনও উচিত নয়।'

তারপর চিত্রকর্ণও নিজের দেহদানের কথা পাড়ল। তার

বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সিংহ তাকেও খেতে চাইবে না। কিন্তু সে দেহদানের কথা বলতে না বলতেই বাঘ তার কুক্ষি বিদারণ করে দিল। সকলে মিলে তার মাংস খেল।

এই জন্যই আমি বলছিলাম—

ধীর যে, তাহারও বুদ্ধি খলের বচনে টলে যায়।
বিশ্বাস যে করে তাতে, মরেই সে চিত্রকর্ণ-প্রায়।'

সে যাক। তৃতীয় ধূর্তের কথা শুনে ব্রাহ্মণ নিজের মতিভ্রম সম্পর্কে নিশ্চিত হল। সে ছাগটিকে ফেলে দিয়ে স্নান করে নিজের বাড়ী ফিরল। ধূর্তগুলো পাঁটাটাকে নিয়ে গিয়ে ভোজ লাগাল।

তাই বলছিলাম—

নিজে সত্যবাদী ব'লে সত্যবাদী ভাবে যে দুষ্টকে,
ছাগবাহী বিপ্রসম সেই ব্যক্তি সহজেই ঠকে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মেঘবর্ণ, তুমি শত্রুদের মধ্যে এতকাল ছিলে কী করে? তাদের অনুনয়ই বা করলে কী ভাবে?'

মেঘবর্ণ বলল, 'প্রভুর কার্যসিদ্ধির জন্য অথবা নিজের প্রয়োজন-বেশ কী না করা যায়? দেখুন—

যে-ইন্ধন জ্বালাইবে, লোকে তাহা বহে না মাথায়?
যে বৃক্ষেরে উপাড়িবে, নদী তারি পদ ধুয়ে যায়।

লোকে বলে—

স্বকার্য-সাধন লাগি শত্রুকেও বুদ্ধিমানে বয় স্কন্ধ 'পরে
বৃদ্ধ সে ভুজঙ্গ যথা ভেকগণে বয়েছিল ভক্ষিবার তরে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

মেঘবর্ণ গল্প বলল,—

বৃদ্ধ সাপ ও ব্যাঙদের গল্প

এক জীর্ণ উদ্যানে মন্দবিষ বলে এক সাপ থাকত। অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল বলে সে নিজের আহারটাও অন্বেষণ করতে পারত না, এক ডোবার ধারে পড়ে থাকত। এক ব্যাঙ তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আহার অন্বেষণ কর না যে, কী ব্যাপার?' সাপ বলল, 'যান ম'শয়, আমার মন্দ ভাগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে কী করবেন?' ব্যাঙটার কৌতুক জন্মাল, সে সেই সাপকে বলল, 'বলোই না।' সাপ বলল, 'ম'শয়, এই ব্রহ্মপুরের কৌণ্ডিন্য বলে এক ব্রাহ্মণের বিংশতি-বর্ষীয় সর্বগুণান্বিত পুত্রটিকে আমি দুর্দৈব-বশতঃ নৃশংসভাবে দংশন করেছিলাম। তার সেই পুত্রের নাম ছিল সুশীল; তাকে মৃত দেখে কৌণ্ডিন্য শোকে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। সে সময় ব্রহ্মপুরবাসী তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তার পাশে এসে বসল। কথাই আছে—

উৎসবে, বিপদে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষ ও বিপ্লব সময়,
রাজদ্বারে, শ্মশানেতে—সঙ্গী হলে, বন্ধু তারে কয়।

কপিল নামে এক স্নাতক বলল, 'ওহে কৌণ্ডিন্য, তুমি যে বড়ই মূঢ় দেখছি; এভাবে বিলাপ করছ কেন? শোনো—

জাত-মাত্রে প্রথমেই অনিত্যতা ধাত্রী-সম ক্রোড়ে তুলি লয়,
জননী তাহার পর; সুতরাং শোক-করা উচিত তো নয়।
কোথা গেল ভূপালেরা, তাঁহাদের সৈন্যবল বাহনাদি লয়ে?
ভূমি আজও পূর্ববৎ রহিয়াছে তাহাদের মৃত্যুসাক্ষী হয়ে।

জান তো—

জন্মেছে যে, একদা সে নিশ্চিতই মরে;
মরে যে, আবার জন্মে। এই ধরণীতে,
— আজ হোক, হোক নাকো শতবর্ষ পরে,
প্রাণীমাত্রে একদিন হয়ই মরিতে।

কায় সে আসন্নধ্বংস, সম্পদ সে আপদের স্থান,
মিলন বিয়োগসঙ্গী, জায়মান সকলি নশ্বর।
হইলেও অলক্ষিত, প্রতিক্ষণ কায় ক্ষীয়মান,
অদগ্ধ কুম্ভ সে যেন গলিতেছে জলের ভিতর।
দিনে দিনে জীব যায় অগ্রসরি মরণের পানে,
দণ্ডিতেরে লয়ে যায় পদে পদে যথা বধ্যস্থানে।

কারণ— জীবন, যৌবন, রূপ, ধনের সঞ্চয়,
ঐশ্বর্য বা প্রিয়সঙ্গ—কিছু নিত্য নয় ;
এগুলিতে পণ্ডিতের মোহ নাহি হয়।
কাষ্ঠ এসে কাষ্ঠে ঠেকে কিছুক্ষণ তরে,
মিলিয়া, বিযুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।
জাতমাত্রে এই মত মিলি পরস্পরে
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কে কোথায় সরে !
পথিক আশ্রয় লয়ে কোনো তরুতলে
বিশ্রাম করিয়া পুনঃ যথা পথ চলে,
জাতমাত্রে এইমত আসে আর যায়,
কোথা থাকে তরু সেই—পথিক কোথায় !

কে না জানে ?

পঞ্চভূতে-গড়া দেহ পঞ্চত্বে মিলায়।
যে-যাহার যোনি লভে দুঃখটা কি তায় ?
ধরা পড়ে জীব যত স্নেহের বন্ধেতে,
বেঁধে শোক শঙ্কু তত তার হৃদয়েতে।
সুচির আশ্রয় কভু পায় কারো কেহ ?
ছেড়ে যেতে হয় নাকি নিজেরই এ দেহ ?
সংযোগ নিজেই করে বিয়োগ জ্ঞাপন,
জন্ম হলে অনিবার্য হয়ই মরণ।
আপাত মধুর বটে প্রিয়সম্মিলন,
ফল সে দারুণ—যেন অপথ্য-ভোজন।

এ কথা মানতেই হবে যে—

নদীস্রোত চলে যায়, কভু না দাঁড়ায়।
মর্ত্য-আয়ু নিয়ে তথা রাত্রি দিন ধায়।
সাধু সঙ্গ সুখ দেয়; সে-সুখও যে চায়
সে-সঙ্গের অবসানে দুঃখই সে পায়।
সৎ-এর সঙ্গও সাধু ছাড়ে যদি পারে;
মনের বিয়োগ-ক্ষত ভেষজে না সারে।
সগরাদি রাজাদের সুকীর্তি সে কত!
তাঁদের মতই তাঁরা কোন্ শূন্যে গত!
যমরাজ উগ্রদণ্ড—এই ভাবনায়,
বর্ষায় জলসিক্ত চর্মবন্ধ-প্রায়
শিথিল হয়েন বিজ্ঞ সকল চেষ্টায়।
প্রথম যে রাত্রে গর্ভে আসে নরবীর,
সে-হতে স্খলন তার না হয় গতির,
চলি যায় মৃত্যুপানে প্রত্যহ সে ধীর।

সংসারটা কী সেটা বিচার করো, এ শোক তো মোহ ছাড়া কিছু নয়। দেখো— মোহই কারণ না হয় যদি, বিয়োগ কারণ হয়—

দিনে দিনে না-বাড়ি শোক কেমনে পায় ক্ষয়?

সুতরাং তুমি কী তা বোঝার চেষ্টা করো, শোকচর্চা ছাড়ো কারণ—

মর্মভেদী আয়ুধের সহসা পতনে
প্রগাঢ় যে শোকাঘাত পড়ে আসি মনে
মহৌষধ তার আছে শুধু অ-স্মরণে।'

তার এই সব কথা শুনে কৌণ্ডিন্যের যেন চটকা ভাঙল, সে বলল, 'তাহলে, এখন আর এই গৃহ-নরকে বাস করি কেন? আমি বনে চললাম।' কপিল পুনরায় বলল—

বৈরাগ্য-অভাব যদি, বনে সুখ নাই;
ঘরেতেই তপ করে জিতেন্দ্রিয় জন।

অকুৎসিত কর্মে যার প্রবৃত্তি সদাই,
বীতরাগ যেবা, তার ঘরই তপোবন।

কেন না—

যে-কোনো আশ্রমে, করি চিত্ত সমাহিত
ধর্ম-অনুষ্ঠানে লাগো, হ'লেও দূষিত।
সর্বভূতে সমভাবই ধর্মের কারণ ;
নয়—নয় দণ্ড কিম্বা গৈরিক-ধারণ।

কথাই আছে—

কেবল বাঁচার লাগি ভোজন যে করে,
স্ত্রীসঙ্গ করে যে শুধু অপত্যের তরে,
সত্য-কথন ছাড়া বাক্য নাহি সরে,
দুস্তর সংসার-দুঃখ সেইজন তরে।

বিশেষতঃ—

জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, আর বেদনার
স্থানই এই অসার সংসার।—সুখ ত্যাগে তার।

কারণ— দুখই আছে, সুখ নাই এ সংসারে, হায়।
দুঃখের প্রতিকারই 'সুখ'-সংজ্ঞা পায়।'

কপিলের কথা শুনে কৌণ্ডিন্য বলল, 'সত্যিই তাই।' তারপর সেই শোকাকুল ব্রাহ্মণ আমাকে এই বলে অভিশাপ দিল, 'আজ হতে তুই ব্যাঙদের বাহন হবি!'

কপিল আবার বলল, 'উপদেশ শোনার মত ধৈর্য এখন তোমার নাই। তোমার হৃদয় শোকাবিষ্ট হয়ে আছে। তবু কী করতে হবে, তা শুনে রাখো—

সঙ্গ সে সর্বথা ত্যাজ্য। সঙ্গ যদি ছাড়া নাই যায়,
সাধুদের সঙ্গ কোরো। সাধুসঙ্গ মহৌষধ-প্রায়।'

কপিলের উপদেশামৃত পান ক'রে কৌণ্ডিন্যের শোকানল প্রশমিত হল, সে বিধিমত দণ্ডী হয়ে গেল। আর আমি ব্রাহ্মণের শাপটা ভোগ করার জন্য ব্যাঙদের বয়ে বেড়াবার উদ্দেশ্যে এখানে বসে আছি।'

সেই ব্যাঙ গিয়ে তাদের রাজা জালপাদের কাছে এই সংবাদ দিল। তা শুনে ব্যাঙদের সেই রাজা এসে সাপের পিঠের উপর চেপে বসলেন। সাপটা তাঁকে পিঠে নিয়ে বিচিত্র গতিতে ঘুরে এল। পরদিন তাকে চলতে অসমর্থ দেখে ব্যাঙ-রাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ এত মন্দগতি কেন ?'

সাপ বলল, 'মহারাজ, আহারের অভাবে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি।'

ব্যাঙ-রাজ বললেন, 'আমি আদেশ দিচ্ছি, ব্যাঙ খাও।'

সাপ বলল, 'আপনার এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলাম।' এই ব'লে, সে ক্রমে ক্রমে সব ব্যাঙগুলিকে খেয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত, সেই ডোবা একেবারে নির্মণ্ডূক হয়েছে দেখে, সে সেই ব্যাঙরাজকেও গ্রাস করল।

এই জন্যই বলছিলাম—

'স্বকার্য-সাধন তরে
শত্রুদেরও বুদ্ধিমান বয় স্কন্ধ 'পরে।'

মহারাজ, এখন এ-সব পুরাবৃত্ত-কথন থাক। আসল কথা হচ্ছে, এই হিরণ্যগর্ভ রাজা সর্বরূপেই সন্ধি-যোগ্য। আমার মত হচ্ছে, তার সঙ্গে সন্ধি করা হোক।'

মেঘবর্ণের কথা শুনে রাজা বললেন, 'এ আবার তোমার কী রকম বিচার হল ? ওকে তো আমরা হারিয়ে দিয়েছি। আমার আজ্ঞায় সে যদি আমার সেবায় লাগে, তবে তাই হোক। নইলে তার সঙ্গে যুদ্ধ হোক।'

এমন সময় শুক জম্বুদ্বীপ থেকে এসে বলল, 'মহারাজ, সিংহল দ্বীপের রাজা সারস সম্প্রতি জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে রয়েছেন।'

রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ? কী ?'

শুক আবার সে-কথা বলল।

গৃধ্র আপন-মনে বলে উঠলেন, 'বাহবা চক্রবাক! বাহবা মন্ত্রী! সাধু! সাধু!'

রাজা সকোপে বললেন, 'ওকে থাকতে দাও না! আমি গিয়ে ওকে সমূলে উৎপাটন করব!'

দূরদর্শী হেসে বলল—

শরৎ-মেঘের মত করিও না থেকে থেকে কেবলি গর্জন।
অপরের ইষ্টানিষ্ট—অভীষ্ট যা, প্রকাশ না করে মহাজন।

আর এক কথা—

যুগপৎ বিরোধিতা বহু রাজ সাথে, উচিত তো নয়!
দর্পী সাপও বহুতর পিপীলিকা-হাতে নাশপ্রাপ্ত হয়।

মহারাজ, সন্ধি-স্থাপন না ক'রে এখান থেকে যাওয়া চলবে কি? কারণ, তা হলে শত্রুর কর্তব্য হবে আমাদের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করা। তা ছাড়া—

ব্যাপার কী না বুঝিয়া ক্রোধের যে বশীভূত হয়,
বেজী-ঘাতী বিপ্র-সম অনুতপ্ত হয় সে নিশ্চয়।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?' দূরদর্শী বলল—

ব্রাহ্মণ ও বেজীর গল্প

উজ্জয়িনীতে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার ব্রাহ্মণীর সন্তান হয়েছিল। একদিন ব্রাহ্মণী তার কচি বাচ্চার রক্ষণের জন্যে ব্রাহ্মণকে গৃহে রেখে স্নান করতে গেল। এমন সময় ব্রাহ্মণকে পার্বণশ্রাদ্ধ দেওয়ার জন্য রাজার আহ্বান এল। ব্রাহ্মণ ছিল আজন্মদরিদ্র, সে ভাবল, শীঘ্রই যদি না যাই, তবে অন্য-কেউ এ শ্রাদ্ধ গ্রহণ করে ফেলবে। কথাই আছে—

নেওয়া, দেওয়া, যে-কাজটা করণীয় আর—
তক্ষণই ফেলে না যে করি,

ইহাদের রস ভাগ্যে জোটে না তাহার।

সবই রস কালে লয় হরি'।

কিন্তু, এখানে শিশুর কোনো রক্ষক নাই। তাহলে কী করি? ঐ নকুলটাকে সুতনির্বিশেষে দীর্ঘকাল পালন করা হয়েছে, ওকেই শিশুর

রক্ষক নিযুক্ত ক'রে যাই।' তাই ক'রে সে বেরিয়ে পড়ল। বেজীটা শিশুর কাছে এসে দেখল—একটা কেউটে সাপ। সে ক্রোধে সেটাকে খণ্ড খণ্ড করে খেয়ে ফেলল। তারপর, ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে, রক্তাক্ত মুখ ও পা নিয়েই সে সত্বর গিয়ে তার দুইপায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ তাকে সেই অবস্থায় দেখে চিন্তা করল, এ আমার পুত্রটিকে খেয়ে ফেলেছে। আর তাই ভেবে তাকে মেরে ফেলল। তারপর সে যখন এগিয়ে এসে দেখল, তার শিশু বেশ সুস্থই রয়েছে, একটা সাপ নিহত হয়েছে, তখন তার খুব অনুতাপ হল।

এই জন্যই বলছিলাম—

ব্যাপার কী না জানিয়া ক্রোধের যে বশীভূত হয়
বেজী-ঘাতী বিপ্র হেন অনুতপ্ত হয় সে নিশ্চয়।

শাস্ত্রে বলে—

কাম ক্রোধ মোহ লোভ গর্ব আর মান—
এ ছয়ের ত্যাগই হল আনন্দ-নিদান।'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, আপনি তাহলে এই সিদ্ধান্তই করছেন?'

মন্ত্রী বলল, 'হাঁ। কেন না—

মন্ত্রীর পরম গুণ—বিতর্ক ও বুদ্ধির স্থিরতা,
পরমার্থে মনোযোগ, মন্ত্রগুপ্তি এবং দৃঢ়তা।

এ কথাটাও মনে রাখা উচিত—

হঠাৎ না-কোরো কিছু, অবিবেকই আপদ কারণ,
গুণমুগ্ধা লক্ষ্মী নিজে বিবেকীরে করেন বরণ।

এখন যদি আপনি আমার কথামত কাজ করেন, তাহলে সন্ধি করে ফেলুন। কেন না—

কার্য-সাধনের আছে চারিটি উপায়—শাস্ত্রে তাই কয়।
সংখ্যাতেই চার তা'রা, একমাত্র সাম দিয়ে সিদ্ধিলাভ হয়।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ক'রে সত্বর তা সম্ভব হয় ?'

মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, সত্বরই হবে। কারণ—

দুর্জন যে—মাটির ঘটের মত ; একটুতে ভাঙে,
সে ভাঙাটা যায় নাকো জোড়া।
সুজন যে—সোনার ঘটের মত ; ভাঙে না সহজে,
অনায়াসে ভাঙা যায় জোড়া।

তা ছাড়া,—

অজ্ঞজনে তুষ্ট-করা সহজেই যায়,
বিশেষজ্ঞে অনায়াসে আরও
অল্পবুদ্ধি অবিনীত জনে তুষ্ট-করা
সাধ্যাতীত হয় যে ব্রহ্মারও।

ওদের ঐ রাজা হচ্ছেন ধর্মজ্ঞ। মন্ত্রীটিও যে সর্বজ্ঞ, এ কথা পূর্বেই আমি মেঘবর্ণের কথা থেকে বুঝেছিলাম। তাঁর কাজ দেখেও বুঝেছি। কারণ—

অপ্রত্যক্ষ গুণ-বৃত্তি ক্রমে ক্রমে হয় অনুমিত।
পরোক্ষবৃত্তির কর্ম ফলদ্বারা তাই পরিচিত।'

রাজা বললেন, 'কথা কাটাকাটি করে লাভ নাই। তোমার যা অভিপ্রেত হয়, করো।' এই মন্ত্রণা ক'রে মহামন্ত্রী গৃধ্র, 'তা হ'লে যা উচিত, তাই করা যাক'—এই বলে দুর্গমধ্যে চললেন।

রাজা হিরণ্যগর্ভের চর বক এসে নিবেদন করল, 'মহারাজ মন্ত্রী গৃধ্র সন্ধি করতে আমাদের কাছে আসছেন।' রাজহংস বললেন, 'মন্ত্রী, আবার কোনো অভিসন্ধি নিয়ে আসছে!' সর্বজ্ঞ একটু হেসে বলল, 'মহারাজ, শঙ্কার কিছু নাই, এই দূরদর্শী একজন মহাশয় ব্যক্তি। হয়তো বা মন্দমতিদের নিয়মই এই ; কখনো বা তা'রা মোটেই সন্দেহ করে না, কখনো বা সব কিছুতেই শঙ্কা করে। কথায় বলে—

জলেতে দেখিয়া রাতে তারকার ছায়া
তাদের কুমুদ-ভাবি ঠকিয়াছে হাঁস।

সিতোৎপলে দিনে তাই মূর্খ ভাবে মায়া।
কুহক-চকিত করে সত্যে অবিশ্বাস।
সুজনেও অবিশ্বাস দুর্জনের চিতে
দুগ্ধে তপ্ত পেয়ে শিশু ফুঁ দেয় দধিতে।

তাই বলছি, মহারাজ, তার পূজার জন্য যথাশক্তি রত্ন-উপহার আদি সামগ্রী সাজিয়ে ফেলুন।' পূজার আয়োজন হয়ে গেলে চক্রবাক নিজে গিয়ে মন্ত্রী গৃধ্রকে সসম্মানে নিয়ে এল, রাজার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে, তাকে বসবার আসন দিল।

চক্রবাক বলল, 'এ সবই আপনার অধীন, স্বেচ্ছামত এই রাজ্য ভোগ করুন।'

রাজহংস বললেন, 'হাঁ, তাই।'

দূরদর্শী বলল, 'তাই না-হয় হল, কিন্তু এখন এসব বাগ্-বিস্তার কোনো প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে বলে—

লোভীজনে বশ করো ধনরত্ন দিয়া;
গর্বিতেরে করো বশ কৃতাঞ্জলি হ'য়ে;
মূঢ়জনে করো বশ মন জোগাইয়া;
পণ্ডিতেরে করো বশ সত্য তথ্য কয়ে।

অন্যত্র পাই—

মিত্রকে করো বশ প্রীতি সুধা-দানে,
সম্ভ্রম দিয়া বশ করো জ্ঞাতিগণে,
স্ত্রী ও ভৃত্যে বশ করো দানে আর মানে,
আর সবে করো বশ মিষ্ট আচরণে।

সুতরাং ইদানীং সন্ধি করা হোক। রাজা চিত্রবর্ণ অতীব প্রতাপশালী।'

চক্রবাক বলল, 'কী ভাবে সন্ধিস্থাপন করা উচিত, বলুন?'

রাজহংস জিজ্ঞাসা করলেন, 'সন্ধি কয় প্রকারের হতে পারে?'

গৃধ্র বলল, 'বলছি, শুনুন—

বলী শত্রু যদি তারে করে আক্রমণ,
আপন্ন হইয়া রাজা, না দেখি উপায়,
সময় লইয়া করে সন্ধি অন্বেষণ।

এ হল আপৎকালের সন্ধি ; এ সন্ধি সার্বত্রিক নয়। সন্ধি সম্বন্ধে যাঁরা বিচক্ষণ, তাঁরা ষোল প্রকার সন্ধির কথা বলেন, যথা—

'কপাল'-সন্ধিটি শুধু 'সম' সংজ্ঞা পায়,
দু' পক্ষেই তুল্যরূপ শর্ত মানে তায়।
অর্থাদি দানের ফলে ঘটে যে মেলন
'উপহার'-সন্ধি তারে পণ্ডিতেরা কন।
কন্যা দিয়া যে সন্ধিটি সম্পাদিত হয়
তাহারে 'সন্তান'-সন্ধি সর্বজনে কয়।
সজ্জন-সহিত সন্ধি মিত্রতার পরে,
'সঙ্গত' বলিয়া তারে পণ্ডিতে আদরে।

যাবদায়ুঃ কার্য যার একই-প্রকার,
কিছুতেই বিচ্ছিন্নতা হয় না যাহার,
সঙ্গত-সন্ধি সেই সুপ্রকৃষ্ট ; তাই
অন্যেরা দেয় তাকে কাঞ্চন-সংজ্ঞাই।

উচ্ছেদিতে এক শত্রু, শত্রু সাথে আর
প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে-সন্ধি করার,
স্বকার্যসিদ্ধির লাগি হয় তাহা কৃত
'উপন্যাস'-সন্ধি নামে হয় তা বিদিত।

'পূর্বেতে করেছি আমি এর উপকার
এক্ষণে এ উপকার করিবে আমার'—
এই ভেবে যদি কোনো সন্ধি করা হয়,
সে-সন্ধিকে পণ্ডিতেরা 'প্রতীকার' কয়।

'এর আমি ইদানীং করি উপকার।
ভবিষ্যতে এ-ও হিত করিবে আমার'—

এই ভেবে কৃত সন্ধি—দৃষ্টান্ত যাহার
রাম-সুগ্রীবের জোট—সে-ও 'প্রতীকার'।
একই প্রয়োজনে যাহা অনুষ্ঠিত হয়
সম্যক নির্দিষ্ট যার সীমা ও সময়,
'সংযোগ'-সন্ধি তারে পণ্ডিতেরা কয়।
'দুজনের সেনাপতি করি যাক রণ,
উদাসীন র'ব মোরা'—করি এই পণ
দুই নৃপতির মধ্যে হইলে মেলন,
'পুরুষান্তর'-সন্ধি বলে বিজ্ঞজন।
'একা তুমি করো মোর এ কার্য-সাধন'—
যে-সন্ধিতে শত্রু রাখে এইমত পণ,
'অদৃষ্ট-পুরুষ'-সন্ধি তাহার বর্ণন।
বলী শত্রু যে-সন্ধিতে রাজ্যভাগ লয়
তাহারে 'আদিষ্ট'-সন্ধি সন্ধিবিদে কয়।
সন্ধি যদি করা হয় নিজসৈন্য সনে
'আত্মাদিষ্ট'-সন্ধি তারে কয় বিজ্ঞজনে।
সব দিয়া যে সন্ধিটি বাঁচাতে জীবন
'উপগ্রহ'-সন্ধি তাহে বলে সর্বজন।
'পরিক্রয়'-সন্ধি তাই, বাকীটি বাঁচাতে
কোষের কিছু বা সবই দিতে হয় যাতে।
সারবতী ভূমি দানে যে সন্ধিটি হয়,
তাহারে 'উচ্ছিন্ন'-সন্ধি পণ্ডিতেরা কয়।
সমগ্র ফসল দানে হয় যে মিলন
'পরভূষণ'-সন্ধি তারে কয় বিজ্ঞজন।
দফাতে দফাতে যদি ফল দিতে হয়
'স্কন্ধোপনেয়'-সন্ধি বিজ্ঞে তারে কয়।
প্রতীকার, কন্যাদান, মৈত্রী, উপহার—
সত্যকার সন্ধি হল শুধু এই চার।

সঙ্গত ছাড়া, সন্ধি এক 'উপহার';
তাহারই রকম ফের বাকী যত আর।
বিনা লাভে ফেরে না তো আক্রমক বলী।
'উপহার' ছাড়া, তাই, সন্ধি কাকে বলি?'

রাজা বললেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত, এক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত, উপদেশ করুন।' দূরদর্শী বলল, 'আঃ, কী যে বলেন!

যে দেহ করিবে নষ্ট আধি ব্যাধি আর পরিতাপ
আজ কিম্বা কালই হোক, তার তরে কে করিবে পাপ?
জলমধ্যে চন্দ্র হেন দেহীদের জীবন চঞ্চল,
সে কথা জানিয়া বিজ্ঞে আচরেন নিত্যই মঙ্গল।
বসুধার আধিপত্য ভেসে চলে যায়,
বায়ুমুখে জলদের প্রায়,
চিহ্নহীন, কে জানে কোথায়!
বিষয়-সম্ভোগ সুখ মরে তিক্ততায়।
ক্ষণস্থায়ী মানবের প্রাণ,
তৃণাগ্রের শিশির সমান;
পরলোক-পথে শুধু ধর্মই সহায়।
মৃগতৃষ্ণার মত অসার সংসার;
ধর্ম ও সুখের লাগি চেষ্টা আছে যার
সজ্জন সাথে করে 'সঙ্গত'ই সার।

তাই আমার মতে 'সঙ্গত'-সন্ধিই করা উচিত। কারণ,—

অশ্বমেধ-যজ্ঞ হোক হাজার হাজার,
সত্যের সাথে তবু তুলনা কি তার?

সুতরাং তিন সত্যি করে এই দুই রাজার মধ্যে কাঞ্চন-আখ্য সন্ধিটিই করা হোক।'

সর্বজ্ঞ বলল, 'হাঁ, তাই হোক!'

তারপর, মন্ত্রী দূরদর্শীকে বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়ে পূজা করা হল। সে হৃষ্টমনে চক্রবাককে সঙ্গে নিয়ে রাজা ময়ূরের কাছে ফিরে গেল।

রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রের কথামত বহু মান ও ধন দিয়ে সর্বজ্ঞকে সাদর সম্ভাষণ করলেন, তার প্রস্তাবিত সন্ধি স্বীকার করে নিয়ে তাকে রাজহংসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দূরদর্শী বলল, 'মহারাজ, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। এখন আমাদের স্বদেশ বিন্ধ্যাচলে ফেরা যাক।' নিজের দেশে ফিরে সকলেই মনের সুখে বাস করতে লাগল।

বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কী বলব, বলো।'

রাজপুত্রেরা বলল, 'আর্য, আপনার প্রসাদে আমরা রাজাদের কর্তব্যাকর্তব্য সংক্রান্ত সবই জ্ঞাত হলাম। জেনে আমাদের আনন্দ হল।'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'তা হলে এখন শান্তি-বাচনটি হয়ে যাক—

বিজয়ী নৃপতিবৃন্দ সন্ধিতেই সদা যেন হর্ষ খুঁজে পান ;
সাধুগণ হন্ নিরাপদ ; সুকৃতির কীর্তি যেন থাকে বর্ধমান ;
নীতি যেন মন্ত্রীদের বক্ষে লেগে থাকে, বারাঙ্গনা-হেন
তাদের অধর চুম্বি ; রাজ্য ভরে মহোৎসব নিত্য চলে যেন।

সকলেই সুখী হোক, সকলেই হোক নিরাময়
সকলে দেখুক শুভ, কারো যেন দুঃখ নাহি রয়।